মূল

ডা. জাকির নায়েক

সূচিপত্র

বিষয়/পৃষ্ঠা

স্বাগত বক্তব্য

আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজনেরা এবং আমার ভাইবোনেরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই ইসলামী সম্ভাষণে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দয়া এবং রহমত আপনাদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক।

আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে- ‘মুসলিম উম্মাহ’র মধ্যে ঐক্য’। বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; একেবারে আলাদা আর খুবই স্পর্শকাতর ইস্যু।

গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে, একথায় কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না যে, ‘মুসলিম উম্মাহ’র মধ্যে কোনো ঐক্য বা একতা নেই।’ এজন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স।

আর টপিক্সটা একেবারেই আলাদা; কারণ আপনারা সবাই হয়তো একথাটা জানেন যে, আমার বেশিরভাগ বক্তব্যের উদ্দেশ্য থাকে ‘দাওয়াহ’। এতে প্রধান লক্ষ্য থাকে অমুসলিমরা আর সেই সাথে মুসলিম ভাইবোনেরা।

আমি সাধারণত দুই ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকি; একটা ধরণ হচ্ছে- Comparetive Religion. ধরুন, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য, যিশুখ্রিস্ট কি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন? ইত্যাদি।

যদিও এই বক্তব্যগুলো দেওয়ার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে- অমুসলিম ভাই-বোনেরা; তাদেরকে ইসলাম ধর্ম সর্ম্পকে জানাচ্ছি। তবে এতে মুসলিম ভাই-বোনদেরও উপকার হয়। মুসলিম ভাই-বোনেরা তাদের অমুসলিম বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত দিতে পারেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে- এই Comparetive Religion ব্যাপারটা উভয়ের জন্যেই। অর্থাৎ মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্যই। অমুসলিমরা জানতে পারছে ইসলাম সর্ম্পকে আর মুসলিমরা জানতে পারছে কীভাবে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিতে হবে।

আর আমি অন্য যে ধরনের বক্তব্য দেই, সেগুলো এমন কিছু ইস্যুর ওপর- যেগুলো দিয়ে মিডিয়া ইসলামের ওপর আক্রমণ করে। যেমন- ইসলামে নারীর অধিকার, যারা ভাবে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে ইসলাম সেকেলে হয়ে গেছে তাদের জন্য ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় ধরনের বক্তব্যগুলোও উভয়ের জন্যই। এতে মুসলিমরা জানতে পারে ইসলাম নারীদেরকে কী অধিকার দিয়েছে, ইসলাম কতটুকু বিজ্ঞাসম্মত; আর পাশাপাশি অমুসলিমরাও জানতে পারে এই সত্যধর্ম তথা দ্বীনুল হক কী বলছে। তবে এরকম বক্তব্য এ পর্যন্ত খুব কমই দিয়েছি, যে বক্তব্যটা সমগ্র মুসলিমদের জন্য। যেমন- আল কুরআন কি অর্থ বুঝে পড়া উচিত? কারণ, কিছু মুসলিম বলে যে, কুরআন না বুঝে পড়লেও চলবে; সে জন্য বক্তব্যটা দিয়েছে। অথবা দাওয়াহ। এ বক্তব্যগুলো মূলত মুসলিমদের জন্য, যদিও এগুলোতে অমুসলিমদেরও উপকার হবে। তবে এগুলোর প্রধান লক্ষ্য ছিলো মুসলিম ভাই-বোনেরা। আর এসব কারণেই আজকের বক্তব্যটা একেবারেই আলাদা; তা শুধু মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য। যদিও অমুসলিম ভাই-বোনদেরও উপকার হবে। তবে প্রধান লক্ষ্য থাকছে মুসলিম ভাই-বোনেরা। আজকের বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে- 'মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য'।

মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য

'মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য' হচ্ছে- আজকের বিশ্বে খুবই স্পর্শকাতর ইস্যু। এটা এমন স্পর্শকাতর যে, মুসলিমদের উদ্দেশ্যে দেওয়া অন্য বক্তব্যগুলো এতো স্পর্শকাতর নয়। সামান্য কয়েকজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, কুরআন না বুঝে পড়লেও চলবে; তবে অধিকাংশ মনে করেন অর্থ বুঝে পড়তে হবে। সামান্য কিছু মুসলিম মনে করে যে, দাওয়াহ না দিলেও চলবে; তবে অধিকাংশ মুসলিম মনে করেন দাওয়াহ অপরিহার্য। তবে 'মুসলিমদের মধ্যে একতা' টপিক্সটি খুবই স্পর্শকাতর। এ টপিক্সটার সাথে আমরা সকল মুসলিমই জড়িত আছি। সেজন্য বলছি এটা স্পর্শকাতর। তাই আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করবো, আপনারা সবাই আমার এই বক্তব্যটা খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন। ইনশাআল্লাহ এতে আপনাদের উপকার হবে আর ধর্মেরও সত্যিকার চিত্রটা ফুটে উঠবে।

আজকের বিষয় মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে ঐক্য বক্তব্যে সবগুলো বিষয় তুলে ধরতে পারবো না, তবে আমি প্রধান প্রধান বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করবো।

মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যহীনতার কারণ

মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে ঐক্য বা একতা না থাকার নানাবিদ কারণ রয়েছে। তবে প্রধান যে কারণে মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে একতা নেই তা হচ্ছে- আমাদের মধ্যে এখন অনেক সম্প্রদায়। এছাড়া মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে অনেকগুলো মতবাদ প্রচলিত আছে; যাকে মাযহাব, মাছলাক অথবা মুছাল্লাক নামে আখ্যা দেওয়া যায়। হবে মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে একতা না থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে-মুসলমানদের মধ্যে অনেকগুলো সম্প্রদায়।

ইনশাআল্লাহ আমরা প্রধান এই পয়েন্টটা নিয়েই আলোচনা করবো আর অন্যান্য পয়েন্ট নিয়েও আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

আমার বক্তব্যের একটা বড় অংশ থাকে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই এই প্রশ্নগুলোর মুখোমুখী হই। এই প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিটা এ কারণেই করা হয় যাতে করে প্রত্যেক মুসলিম ভাই-বোন নিজেই প্রশ্ন করবেন আর নিজেই উত্তর দিবেন। এতে করে আপনারা জানতে পারবেন যে আপনাদের অবস্থানটা আসলে কোথায়?

যে পয়েন্টে ঐক্য হতে হবে

আর আপনারা হয়তো জানেন যে, দাওয়াহ দেওয়ার Muster কী অথবা ইসলাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন কী বলছে? ***(সূরা-আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-৬৪)*** -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [٣:٦٤]

অর্থ: বলো, হে কিতাবের অনুসারীগণ! এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই। প্রথম সাদৃশ্যটা কি? তা হচ্ছে- আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করি না। কোনো কিছুকেই তার শরীক করি না। আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ করি না।

যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো, অবশ্যই আমরা মুসলমানরা আল্লাহর কাছে আমাদের ইচ্ছাকে সমর্পন করলাম।

আমি এর পূর্বে অনেক বক্তব্যেই বলেছি যে, পবিত্র কুরআনের এই আয়াত যা বলছে- "এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক" যদিও এখানে আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে; আমার মতে এটা দ্বারা অমুসলিমদের যে কাউকে বুঝতে পারে। হতে পারে সে হিন্দু অথবা বৌদ্ধ অথবা জৈন। আর যদি আপনি আরেক ধাপ এগিয়ে যান তাহলে এটা দ্বারা মুসলিম উম্মাহ'র সকলের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে।

যখন মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে মতভেদ থাকে সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সমাধান হলো-*(সূরা-আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-৬৪)*

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

অর্থ: "এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই।"

তাহলে কুরআনের এই আয়াতটি আমার মতে মুসলিম উম্মাহ'র জন্যও ব্যবহার করা যায়। এটাই ইসলাহ দেওয়ার সবচেয়ে সেরা উপায়। যাতে করে মুসলিমরা সবাই সরল পথে আসতে পারে।

সাধারণত আপনি যে মুসলিমকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে খাঁটি আর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোনটা? ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে সেরা জ্ঞানের উৎসটা কী?

সে অবশ্যই উত্তরে বলবে- 'কুরআন'। এতে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। সে হয়তো নিয়ম মেনে চলা মুসলিম না; এটা আমরা সবাই জানি এবং মানি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন- পবিত্র কুরআনের পরে জ্ঞানের সবচেয়ে খাঁটি উৎস কোনটা? উত্তর হচ্ছে- 'হাদীস'। এতেও কোনো দ্বিমত নেই। হাদীসকে কেউ সুন্নাহ বলেও অভিহিত করে।

উল্লেখিত দুটি প্রশ্নের উত্তর তথা কুরআন ও হাদীস যে জ্ঞানের প্রধান উৎস তা মুসলমানদের সকলেই মেনে নেবে বা মেনে থাকে, সে যে মাযহাবেরই হোক না কেন।

আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, হাদীসের কিছু প্রকারভেদ আছে। কিছু হাদীস আছে যেগুলোকে বলা হয় 'সহীহ হাদীস'; আবার কিছু হাদীস আছে যেগুলো 'যয়ীফ বা দুর্বল হাদীস' আবার এমনও কিছু হাদীস আছে যেগুলো 'মাওযু তথা জাল হাদীস বা বানানো হাদীস ' নামে অভিহিত। মুসলিমরা কোন হাদীসগুলো মান্য করবে? ঐ হাদীসগুলো মুসলিমরা মেনে চলবে যেগুলো সহীহ তথা নির্ভুল হাদীস বা শক্তিশালী হাদীস।

এখানে তিনটি প্রশ্নের তিনটি উত্তরের মধ্যে মুসলিমদের মধ্যে কোনো মত পার্থক্য নেই। সেগুলো হলো- জ্ঞানের এক নম্বর উৎস হচ্ছে- কুরআন, দুই নম্বর উৎস হাদীস আর এ হাদীসগুলোর মধ্যে যেটিকে আমি মানবো তা হলো- সহীহ হাদীস। এ প্রশ্নগুলোর এই একই জবাব মুসলিমরা দেবে সে যে মাযহাবেরই হোক না কেন। অর্থাৎ এ কথাগুলোর মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

অর্থ: "এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই। "

(সূরা-আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-৬৪)

এই উত্তরের উপর ভিত্তি করে আমরা সবাই সামনে এগিয়ে যাবো।

মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন দল

যখন কোনো মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করি আপনার ধর্ম কী? অথবা আপনি কোন মতবাদ মেনে চলেন? অথবা আপনার মাযহাব কী? বেশিরভাগ ভারতীয় মুসলিম বলে যে তারা হানাফী। অল্প কিছু মুসলিম হয়তো বলবে তারা শাফেয়ী। আর আমি যদি ভারতের বাইরের কোনো মুসলিমকে এ কথাগুলো জিজ্ঞাসা করি, তাহলে তারা হয়তো হানাফী ও শাফেয়ীর পাশাপাশি বলবে যে তারা হাম্বলী বা মালেকী। তবে ভারতে বেশিরভাগ মুসলিম নিজেদেরকে হানাফী বলে পরিচয় দেয় আর কিছু শাফেয়ী বলে পরিচয় দেয়। এছাড়াও আরো কিছু ভাগ আছে কিন্তু এ দুটোই প্রধান।

এবার আমি পরের প্রশ্ন করি, ভাই আপনি কেন হানাফী? কেন আপনি শাফেয়ী নন? এ প্রশ্নের জবাবে যে উত্তর পাই তা হলো- আমার বাবা-মা ছিলেন হানাফী। আমার বাবা হানাফী, আমার মা হানাফী সেজন্য আমিও হানাফী। আমি তখন সেই লোককে প্রশ্ন করি যে, আপনার বাবা শাফেয়ী হলে কী হতো? সে তখন বলে, ভাই জাকির! আমার বাবা শাফেয়ী হলে আমিও শাফেয়ী হতাম। খুব সহজ উত্তর খুব ভালো কথা।

আর একটা সহজ প্রশ্ন, আর তা হলো- আপনার বাবা মা অমুসলিম হলে কী হতো? আপনি তখন কী হতেন? এ প্রশ্ন করলে সে অনেক সময় চুপ থাকে। আপনি আমাকে যুক্তিটা দিলেন, আপনার বাবা মা হানাফী তাই আপনিও হানাফী, আপনার বাবা মা শাফেয়ী তাই আপনিও শাফেয়ী; ঠিক আছে, এটা লজিক্যাল কথা। বাবা মা অমুসলিম হলে তখন কী হতো? সে অনেক সময় চুপ থাকবে। বলি, ভাই আপনি চুপ করে আছেন কেন? তখন সে নরম গলায় বলবে- তাহলে হয়তো আমি অমুসলিমই হতাম। নরমভাবে সে বলবে আমি হয়তো অমুসলিমই হয়ে যেতাম।

বর্তমানে আপনার বয়স হয়তো ৩০/৪০ বছর হবে আর এখন আমার প্রশ্নের আপনি উত্তর দিচ্ছেন- আপনি অমুসলিম হতেন; সেটা হোক হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন। কারণ আপনার বাবা একজন অমুসলিম এবং আপনার মা-ও একজন অমুসলিম।

এখন আমার প্রশ্ন হলো- এতে করে আপনি মাফ পাবেন? সে কোনো কথা বলতে পারবে না, সে জবাব দিতে পারবে না। অর্থাৎ এ কথার উত্তর তার নেই। যদি বলেন, মাফ পাবেন? একথার উত্তর হচ্ছে- ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দুসহ যত অমুসলিম আছেন তারা মাফ পাবেন। কারণ বেশিরভাগের বাবা-মা-ই ছিলো অমুসলিম। সে কোনো কথা বলবে না। তারপর সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমাকে উত্তর দিবে যে, যদি আল্লাহ আমাকে হেদায়েত করেন তাহলে আমি মুসলিম হয়ে যাবো। আমি বললাম, ভালো; আল্লাহ হিদায়াত করলে আপনি মুসলিম হয়ে যাবেন; তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলছেন, ***(সূরা-আনকাবূত, অধ্যায়-২৯, আয়াত-৬৯)*** -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [٢٩:٦٩]

অর্থ: 'যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে সংগ্রাম ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করে। আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় মহান আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।'

এখানে শর্ত হলো আপনাকে সংগ্রাম করতে হবে। যদি আপনি সংগ্রাম করেন তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে হিদায়তে করবেন; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করলে আল্লাহ আপনার সামনে রাস্তা খুলে দেবেন। তাহলে শর্ত হলো- আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনার রাস্তা খুলে দেবেন।

আপনারা গত কয়েকদিন দেখেছেন যে, অনেক অমুসলিম আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, আমিতো অমুসলিম পরিবারে জন্মেছি, এতে আমার দোষটা কোথায়?

আমি তাদের উত্তর দিয়েছিলাম- আপনি যদি এখন ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে পূর্বে কৃত সব গুনাহের মাফ পাবেন। এতে আপনি একটা সুযোগ পাবেন। অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং অনেকে এখনও করছেন ভবিষ্যতেও করবেন। ইসলাম গ্রহণ করলে আপনি পূর্বের গুনাহ থেকে ক্ষমা পেয়ে যাবেন। তাহলে মাফ পাওয়ার জন্য শর্ত হলো আপনাকে সংগ্রাম করতে হবে।

কোনো অমুসলিমকে হয়তো আপনি বলেছেন যে, তাদের ইসলাম ধর্ম মেনে চলা উচিত সত্যকে পাওয়ার জন্য। এমতাবস্থায় যদি কোনো অমুসলিম আপনাকে

প্রশ্ন করে, “আপনি কেনো মুসলিম?” এর জবাবে যদি আপনি বলেন, “আমার বাবা-মা মুসলিম তাই আমিও মুসলিম”। এরপর সে যদি আপনাকে বলে যে, সত্যিকরে বলুনতো, আপনি কি কখনও সত্যকে জানার চেষ্টা করেছেন?

এসব প্রশ্নের মুখোমুখী হওয়ার আগেই আপনার উচিত ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ও ইসলামকে ভালোভাবে জানা। আর ইসলামকে ভালোভাবে জানতে হলে আপনাকে জানতে হবে কুরআন এবং হাদীস।

অমুসলিমদের পাশাপাশি মুসলিমদেরকেও বলবেন যে, আপনারা সত্যের পথে থাকুন।

আমি কী বলতে পারি? আমি তাকে বলতে পারি যে, মাশাআল্লাহ! আপনার বাবা-মা হানাফী বা শাফেয়ী ছিলেন, তারাতো মুসলিম; আমার বাবা-মা-ও মুসলিম ছিলেন। আল্লাহর দয়া ও করুণা, আল্লাহামদুলিল্লাহ।

তাকে পরের প্রশ্ন করবো ভাই, আপনি বললেন আপনি একজন হানাফী। আপনার কোনটি বেশি ভালো? হানাফী বেশি ভালো নাকি শাফেয়ী বেশি ভালো? এ প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ মুসলিম বলবেন যে, চারটা মাযহাব বা মতবাদ চারজন আলেম প্রচলন করেছেন। সুন্নিদের মধ্যে চারটা আলাদা মাযহাব বা মতবাদ, তারা এ উত্তরটাই দেবে। সুন্নিদের মধ্যে চারটা মাযহাব- হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এই চারটা মতবাদই বারহাক্ক তারা চারজনই সঠিক। কিছুলোক বলবেন হানাফী হলে ঠিক আছে, কেউ বলবেন শাফেয়ী হলে ঠিক আছে; তবে অধিকাংশ মুসলিম বলবেন যে, চারজন আলেমই ঠিক বলেছেন, তারা চারজনই সঠিক।

সুন্নিদের চার মাযহাবে মতপার্থক্যে ধরণ

আমি এখন একটা প্রশ্ন করি, যে প্রশ্নটার সাথে মোটামুটি সকলেই পরিচিত আর প্রশ্নটা কোনো কঠিন প্রশ্ন নয়, অনেকটাই সহজ। প্রশ্নটা হচ্ছে- ভাই যদি একজন মহিলা পুরুষকে অথবা একজন পুরুষ মহিলাকে স্পর্শ করে তা হলে তার অযু থাকবে কী না? এ প্রশ্নের উত্তরে একজন শাফেয়ীকে জিজ্ঞাসা করি তাহলে সে কী বলবে? সে বলবে যে, না তার অযু থাকবে না তা ভেঙ্গে যাবে। অর্থাৎ বর্ণিত

অবস্থায় হানাফী মাযহাব মতে অযু ভাঙ্গবে না আর শাফেয়ী মাযহাব মতে অযু ভেঙ্গে যাবে।

এবারে পরের প্রশ্ন। এ প্রশ্নটিও অত্যন্ত সহজ একটি প্রশ্ন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- প্রিয় ভাইয়ের! দুটি কি এক সাথে সঠিক হতে পারে? একজন মুসলিমের জন্য অযু ভেঙ্গে যাবে যদি সে একজন মহিলাকে স্পর্শ করে আর অন্য একজন মুসলিমের অযু ভাঙ্গবে না; যদি সে অযু করা অবস্থায় কোনো মহিলাকে স্পর্শ করে। আমি এখন বলছি দুটি অবস্থাই কি সঠিক হতে পারে? আমি বলছি না যে, কোনটি সঠিক? যদি কোনটি সঠিক তা বলতে যাই তাহলে কুরআন হাদীসে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো, আর তা হচ্ছে- দু পক্ষের কথাই কি সঠিক হতে পারে? আপনারা বলছেন, না। অর্থাৎ দুই পক্ষের কথাই সঠিক হতে পারে না। সহজ প্রশ্ন আর সহজ উত্তর।

যদি এই প্রশ্ন করি যে একজন শিক্ষক শেখালেন, ২+২=৪ আর অন্য একজন শিক্ষক শেখালেন ২+২=৫। তাহলে এ দুজন শিক্ষকের কথাই কি সঠিক হতে পারে? না, দুইজন শিক্ষকের কথাই ঠিক হতে পারে না। যে লোকের অংক সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই সে হয়তো তাকে ঠিক বলতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তির অংক সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানটুকু আছে সে বলবে যে ২+২=৫ হতে পারে না; ২+২=৪ হবে। তাহলে প্রথম শিক্ষক বলেছেন ২+২=৪ আর অন্যজন বললেন ২+২=৫; দুজনের কথাই কি সঠিক হতে পারে? এর উত্তর হলো- না; দুজনের কথাই সঠিক হতে পারে না।

এখন যদি আপনাদের প্রশ্ন করি, একজন শিক্ষক বললেন ৩৭৫ এর সাথে ৬২৫ কে গুণ করলে হবে ১০,০০৫২৫; আর একজন শিক্ষক বললেন ৩৭৫ এর সাথে ৬২৫ কে গুণ করলে হবে ১০,০০৫২৫ হবে না। এখানে দুজনের কথাই কি একসঙ্গে সঠিক হতে পারে? না, দুজনের কথাই সঠিক হতে পারে না। এটা বুঝার জন্য গণিতবিদ হতে হবে না। যদি জিজ্ঞাসা করি কার কথা সঠিক বা কে সঠিক কথা বলছে? তাহলে আপনি ক্যালকুলেটর নিয়ে হিসাব কষে দেখবেন। যদি অংক ভালো পারেন, যদি লজিক্যাল হন তাহলে আপনি ঠিকই বুঝতে পারবেন কে সঠিক। আপনার নিকটে যদি ক্যালকুলেটর না থাকে, আপনি যদি হিসাব বের করতে না পারে তবুও দুজনের কথাই সঠিক হবে না। যদি আপনি জানতে চান যে,

এই দুজন শিক্ষকের মধ্যে কার কথা সঠিক? তাহলে ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে হিসাব করে বলতে পারবেন যে প্রথম জন অথবা দ্বিতীয় জনের কথা সঠিক।

একইভাবে যদি জানতে চান দুই মাযহাবের মধ্যে কার কথাটা সঠিক? হানাফী না কি শাফেয়ী? দুই মাযহাব কি একই সাথে সঠিক হতে পারে? উত্তর হলো না, পারে না। তবে কোন মাযহাবের কথাটা বেশি সঠিক? এটা জানতে হলে ঐ একই পদ্ধতি। আপনাকে দেখতে হবে খাঁটি উৎসগুলো; প্রথমত কুরআন, দ্বিতীয় হাদীস।

তাহলে উক্ত উত্তর দুটোর কোনটা সঠিক, হানাফী না কি শাফেয়ী? এটা সবার পক্ষে জানা সম্ভব নয় যদি না আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে সংগ্রাম করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ***(সূরা-মায়েদা, অধ্যায়-৫, আয়াত-৬)*** -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ-

অর্থ: “হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে; যদি তোমরা অপবিত্র (জানাবাত অবস্থায়) থাকো, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে(গোসল করবে)...........

নামায আদায় করার জন্য অযু করাটা বাধ্যতামূলক। এরপর বলেছেন,

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ-

অর্থ: "তোমরা যদি অসুস্থ থাকো অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ টয়লেট থেকে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে মিলিত হও, স্পর্শ করো এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তয়াম্মুম করবে এবং তা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতে মাসেহ করবে।"

তায়াম্মুমের কথা বলা হচ্ছে কোনো পানি না থাকলে পবিত্র মাটি দ্বারা তাযাম্মুম করবে।

এই আয়াতটায় যা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে- কোনো মহিলা স্পর্শ করলে, এখানে আরবি শব্দ হলো لمس (লামাছ) মূল আরবি শব্দ ماس (মাছা) এটার ওপর ভিত্তি করে কোনো মহিলাকে স্পর্শ করলে, তাহলে আপনাকে অযু করতে হবে আর পানি না থাকলে তায়াম্মুম করতে হবে। অথবা আপনাকে গোসল করতে হবে। এখানে অযু, গোসল ও তায়াম্মুম তিনটি অপশন। কোথায়ও পানি না থাকলে তায়াম্মুম করবেন।

এখন আরবি শব্দ ماس (মাছা) এই শব্দটার দুটি অর্থ। অভিধান খুললে আপনিও দেখতে পারবেন মাছা শব্দের অর্থটা কী। এখানে দুটি অর্থ রয়েছে- ১. শারীরিক স্পর্শ, ২. সহবাস করা।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী (র) এই দুজন মহান আলেম, তারা খুব জ্ঞানী ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (র) এই আয়াতটার অর্থ করেন, যদি কোনো মহিলাকে সহবাস করেন তাহলে আপনার অযু বা তায়াম্মুম করাটা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এখানে তিনি ماس (মাছা) শব্দটার অর্থ নিয়েছেন সহবাস করা। এজন্য যদি আপনি কোনো মহিলাকে স্পর্শ করেন তাহলে আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) এই আয়াতটার অর্থ করেন শারীরিক স্পর্শ। সুতরাং এখানে অর্থ হবে যদি কোনো মহিলাকে স্পর্শ করেন তাহলে আপনার অযু বা তায়াম্মুম করাটা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এখানে তিনি ماس (মাছা) শব্দটার অর্থ নিয়েছেন স্পর্শ করা। এজন্য যদি আপনি কোনো মহিলাকে স্পর্শ করেন তাহলে আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে।

তাহলে এখানে হানাফী মাযহাব মতে আপনি স্পর্শ করলে অযু ভাঙ্গবে না আর শাফেয়ী মাযহাব মতে আপনি কোনো মহিলাকে শারীরিকভাবে স্পর্শ করলেও আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে। তখন আপনাকে আবার অযু করতে হবে।

এখন ماس (মাছা) শব্দের দুটো অর্থ দুজন দুটো অর্থ নিয়েছেন।

ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এবং প্রধান উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন। যদি কুরআন থেকে কোনো সমাধান না পান তাহলে আপনি পরের উৎসে যাবেন। আর পরবর্তী উৎস হচ্ছে- 'হাদীস'। তবে আমরা যদি কুরআনের অন্যান্য আয়াতগুলো দেখি তাহলে সেখানে দেখবো-

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ [٣:٤٧]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ***(সূরা-আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-৪৭)*** -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

এখানেও এই ماس (মাছা) শব্দটাই ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে মারিয়াম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে- প্রধান ফিরিস্তা জিবরাইল (আ) তার কাছে এসে জানালেন যে, তোমার একটা পুত্র সন্তান হবে। মরিয়াম (আ) তখন উত্তর দিলেন, এটা কীভাবে সম্ভব? আমার পুত্র সন্তান কীভাবে হবে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি? সেই শব্দ তথা ماس (মাছা) এখানেও আছে।

এখন আমাদের সবাই বুঝতে পারবেন, যখন মারিয়াম (আ) বললেন আমার পুত্র সন্তান কীভাবে হবে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি? তার অর্থ সহবাস করা, শারীরিক স্পর্শ বুঝানো হচ্ছে না। কারণ শারীরিকভাবে কোনো মহিলাকে স্পর্শ করলে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই; বরং যদি কেউ সহবাস করে তাহলে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সেজন্য তিনি বললেন আমার সন্তান হবে কীভাবে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি? তখন উত্তর আসলো যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোনো কিছু স্থির করেন তখন বলেন- كُن فَيَكُونُ (কুন ফাইয়াকুন), হও আর তখন হয়ে যায়। এখানে ماس (মাছা) শব্দটার অর্থ সহবাস করা।

এছাড়া আমরা যদি নবীজী (সাঃ)-এর হাদীস অধ্যায়ন করি, অর্থাৎ কুরআন বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদের দ্বিতীয় উৎস হাদীস দেখতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে সে হাদীসটা যেন সহীহ হাদীস হয়। আমি একটি সহীহ হাদীস বলছি- যা সুনানে আবু দাউদের ১ নং খণ্ডের সালাম অধ্যায়ে সপ্তম অনুচ্ছেদের ১৭৯ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। *"আয়েশা (রা) বললেন, একবার নবীজী (সাঃ) তার একজন স্ত্রীকে চুমো দিয়ে নামাযে চলে গেলেন। তিনি আবার অযু করেননি। তখন উরওয়া (রা) বললেন, সে স্ত্রী তো আপনি ছাড়া কেউ নন। আয়েশা (রা) তখন হেসে উঠলেন।"* তার মানে সে স্ত্রী তিনি ছিলেন আর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তাহলে আবু দাউদের ১ নং খণ্ডের সালাম অধ্যায়ে সপ্তম অনুচ্ছেদের ১৭৯ নং হাদীসে এটা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেটি সহীহ হাদীস হিসেবে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ মত দিয়েছেন। আর এটাকে সহীহ হাদীস হিসেবে দেওয়া বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে আলবানী (র)-ও রয়েছেন।

এখানে বলা হয়েছে- আমাদের নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ) তিনি অযু করা অবস্থায় ছিলেন এবং এমতাবস্থায় তিনি আয়েশা (রা)-কে চুমো দিয়ে নামাযে গেলেন কিন্তু তিনি আর অযু করলেন না। এটাই প্রমাণ করে 'শরীরিক স্পর্শ করলে অযু ভেঙ্গে যাবে না'। এরকম আরো সহীহ হাদীস আছে। বুখারীর ১ নং খণ্ডের ৫১৯ নং হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে- সেখানে বলা হয়েছে, *"আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি ছিলাম নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং কিবলার মাঝামাঝি এমতাবস্থায় নবীজী (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। তিনি সিজদাহ দেওয়ার সময় আমার পা ধরে ধাক্কা দিলে আমি সরে গেলাম আর তিনি সিজদাহ করলেন।"*

এখানে দেখা যাচ্ছে যে নবীজী (সাঃ) নামাযরত অবস্থায় আয়েশা (রা)-কে স্পর্শ করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে- অযু অবস্থায় কোনো মহিলাকে স্পর্শ করলে অযু ভেঙ্গে যায় না।

এছাড়া অনেক সহীহ হাদীস আছে যেগুলো প্রমাণ করে যে, শারীরিক স্পর্শের কারণে অযু ভেঙ্গে যায় না।

এখন আপনাদের প্রশ্ন করি উল্লেখিত মাসয়ালায় কার মত সঠিক? ইমাম আবু হানিফা না কি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর? উত্তর হচ্ছে- ইমাম আবু হানিফা (র)-এর

মতটাই সঠিক। কারণ তার মতটা পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসের বর্ণনার সাথে মিলে যায়।

এমতাবস্থায় কেউ আমাকে বলতে পারেন, তাহলে কি ইমাম শাফেয়ীর কথাগুলো ভুল? আমি ইমাম শাফেয়ী (র)-কে শ্রদ্ধা করি, আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি এবং ভালোবাসি। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, যদি কেউ কুরআন হাদীস ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ধর্ম বিষয়ে কোনো ফয়সালা দেয় এবং তা সঠিক হয় তাহলে সে দুটো পুরষ্কার পাবে আর যদি ফয়সালা ভুল হয় তাহলে একটি পুরষ্কার পাবে। অর্থাৎ কোনো বিশেষজ্ঞ মুফতি যদি কোনো ফতওয়া দেন আর তা সঠিক হয় তাহলে সে দুটো পুরষ্কার পাবে আর যদি ফতওয়া ভুলও হয় তবে একটি পুরষ্কার পাবে।

আমি বলছি না যে, ইমাম শাফেয়ী (র) জ্ঞানী ছিলেন না, তিনি অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন এবং কুরআন হাদীস সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো। তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, যে সময় ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) বেঁচে ছিলেন সে সময় সকল হাদীস সংগ্রহ করা হয়নি। হাদীস সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে আরো আগে এবং শেষ হয়েছে অনেক পরে।

এমন হতে পারে আবু দাউদের এই হাদীসটা অর্থাৎ ১ নং খণ্ডের সালাম অধ্যায়ে সপ্তম অনুচ্ছেদের ১৭৯ নং হাদীস এবং বুখারীর ১ নং খণ্ডের ৫১৯ নং হাদীসটি ইমাম শাফেয়ীর নিকট পৌঁছেনি। যেহেতু হাদীসটি তার নিকট পৌঁছেনি তাই তিনি দুটো অপশনের একটি বেছে নিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি শারীরিক স্পর্শটাকে সহবাস অর্থে গ্রহণ করেছেন। যেহেতু হাদীসটি তার নিকট পৌঁছেনি।

তাহলে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে, তিনি তার মধ্যে একটি অর্থ গ্রহণ করেছেন। এমন না যে, তিনি ইচ্ছা করেই এমনটি করেছেন, বরং এমন হতে পারে যে, হাদীসটি তার নিকট পৌঁছেনি।

আর একটা উদাহরণ দেই; আপনাদের প্রশ্ন করি যে, নামায পড়ার সময় যেখানে শব্দ করে পড়তে হয়, যেমন- ফজর, মাগরীব ও এশার নামাযে ইমাম যখন সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করেন, এখানে হানাফী মাযহাব যেটা করে তা হলো- যখন তারা জামাতে নামায আদায় করে তখন তারা ‘আমিন’ শব্দটা আস্তে বলে। ইমাম আবু হানিফার মতে অর্থাৎ হানাফী মাযহাব মতে ‘আমিন’ শব্দটা আস্তে

বলতে হবে, মনে মনে পড়তে হবে, জোরে পড়া যাবে না। আর ইমাম শাফেয়ীর মত অনুযায়ী জামাতে নামায আদায়ের সময় 'আমিন' শব্দটা জোরে পড়তে হবে। অর্থাৎ ফজর, মাগরিব আর এশার নামাযে হানাফী মাযহাবের মতানুসারীরা শব্দ করে আমিন বলে না আর শাফেয়ী মাযহাবের মতানুসারীরা শব্দ করে আমিন বলে।

এখানে কারা সঠিক? যদি না জানেন তাহলে কুরআন এবং হাদীস দেখবেন। পবিত্র কুরআনে এমন কোনো আয়াত দেখি না, যেখানে বলা হয়েছে 'আমিন' আস্তে বা জোরে পড়তে হবে। তাহলে এখানেও আমরা পরের উৎসটা দেখবো আর সেটা হলো হাদীস।

সহীহ বুখারীর ১ নং খণ্ডের আযান অধ্যায়ের ১১১ নং পরিচ্ছেদের ৭৮০ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- *"নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, সূরা ফাতিহা শেষ হলে শব্দ করে আমিন বলো; যদি তোমরা ফেরেস্তাদের সাথে শব্দ করে আমিন বলো তাহলে তোমাদের অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে। "*

পরের হাদীসটা সহীহ বুখারীর ১ নং খণ্ডের আযান অধ্যায়ের ১১২নং পরিচ্ছেদের ৭৮১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- *"নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কারো আমিন বলার সময়ে যদি ফেরেস্তাদের মধ্যেও কেউ আমিন বলে, তোমাদের অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে। "*

পরের আরো একটা হাদীস সহীহ বুখারীর ১ নং খণ্ডের আযান অধ্যায়ের ৭৮২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- *"নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, যখন ইমাম বললেন,* غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ *(গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্বয়াল্লিন) শব্দ করে আমিন বলো। তোমাদের আমিন বলার সময়ে যদি ফেরেস্তাদের মধ্যেও কেউ আমিন বলে, তোমাদের অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে। "*

আমি এখানে সহীহ বুখারী থেকেই তিনটি হাদীসের উদ্বৃতি দিলাম যে, সূরা ফাতিহা শেষ হলে শব্দ করে আমিন বলতে হবে। একইভাবে সহীহ মুসলিমে সব মিলিয়ে ৬টি হাদীস আছে এ বিষয়ে। যদি সহীহ মুসলিম পড়েন তাহলে দেখবেন সেখানে ১ নং খণ্ডের সালাম অধ্যায়ে ১১৬ নং পরিচ্ছেদের ৮১১ নং হাদীস থেকে ৮১৬ নং হাদীস পর্যন্ত মোট ৬টি হাদীস বলছে যে, শব্দ করে 'আমিদ' বলতে হবে।

তাহলে আপনাদেরকে আমি বুখারী ও মুসলিমের মোট ৯টি হাদীসের রেফারেন্স দিলাম যেখানে বলা হয়েছে- শব্দ করে 'আমিন' বলতে হবে।

এখন আপনাদের একটা প্রশ্ন করি, এখানে কে সঠিক? ইমাম আবু হানিফা না কি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত। উত্তর হচ্ছে- শাফেয়ী মাযহাবের মতটাই সঠিক। যেটা কুরআন এবং হাদীসের সাথে মিলে যাবে সেটাই মানবেন।

এবার আমি আমার প্রশ্নে আসি, প্রথম প্রশ্নটা হলো- অযু ভেঙ্গে যায় কি না? যদি দুর্ঘটনাবশত কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে স্পর্শ করে বসে অথবা কোনো মহিলা কোনো পুরুষকে? চিন্তা করুন যদি কোনো নও মুসলিম আমাকে জিজ্ঞাসা করে ভাই জাকির, যদি আমার অযু থাকা অবস্থায় কোনো মহিলা আমাকে স্পর্শ করে অথবা আমি তাকে স্পর্শ করি তাহলে আমাকে কি আবার অযু করতে হবে? আমার অযু কি ভেঙ্গে যাবে? তাহলে তাকে কি আমি জিজ্ঞাসা করবো যে, আপনার বাবা হানাফী নাকি শাফেয়ী? তার বাবা তো ছিলো অমুসলিম; তাকে কি বলবো? তাকে তাহলে বলতে হবে কুরআন এবং সহীহ হাদীস অনুযায়ী যেটা সঠিক সেটা। এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ এবং রাসূলের নিকটে তথা কুরআন এবং হাদীসের কাছে। কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করে দেখবো তাহলে উত্তরটা পাবো।

আবার কেউ প্রশ্ন করতে পারে দ্বিতীয় প্রশ্নটা তথা শব্দ করে আমিন বলা নিয়ে। এখানে হানাফী এবং শাফেয়ীর মতামত ভিন্ন ভিন্ন। শাফেয়ী মাযহাব শব্দ করে আমিন বলে আর হানাফী মাযহাব নিরবে আমিন বলে। এখানে বলতে পারেন, তাহলে কি বলেন ইমাম আবু হানিফা ভুল বলেছেন? উনি কি বিষয়টা জানতেন না? নাউজুবিল্লাহ! ইমাম আবু হানিফা (আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন), আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি এবং ভালোবাসি। তবে ব্যাপারটা এমন না যে তিনি ইচ্ছা করে ভুল করেছেন। আমি জানি যে, যে হাদীসগুলোর কথা আমি বললাম সহীহ বুখারী ও মুসলিমের, হয়তো সে হাদীসগুলো তার কাছে পৌঁছেনি।

আমি আপনাদের আগেও বলেছি, আমাদের নবীজী যখন বেঁচে ছিলেন পবিত্র কুরআন তখন সর্ম্পূণভাবে লিপিবদ্ধ ছিলো; আর একাজের তদারকি নবীজী নিজেই করেছিলেন। তার পূর্ণ তদারকিতেই এই পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ হয়েছিলো। আর

কথাগুলো অর্থাৎ হাদীস লিপিবদ্ধ করতে উৎসাহিত করেননি এ কারণে যে, তাহলে কুরআনের সাথে হাদীসগুলো মিশে যেতে পারে।

পরবর্তীতে যখন তিনি ইনতিকাল করলেন আর লোকজন যখন তার কথাগুলো উদ্বৃতি দিতে শুরু করলো এবং কেউ কেউ এমন কথাও বলতে শুরু করলো যা নবীজী হয়তো বলেননি, তখন সাহাবীগণ ভাবলেন ঠিক আছে এখন থেকে আমরা অনুসন্ধান করে দেখবো যে নবীজী এ কথা বলেছেন কি না। তাই হাদীস লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়েছে নবীজী (সাঃ)-এর ইনতিকালের পরে। আর এই চারজন ইমামের সময়ে- অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (আল্লাহ সবাইকে শান্তিতে রাখুন) তখনও হাদীস লিপিবদ্ধ হচ্ছিলো; তখনও সেটা শেষ হয়নি।

পরবর্তীতে ইমাম বুখারী আসলেন, ইমাম মুসলিম আসলেন, ইমাম আবু দাউদ আসলেন, তিরমিযি আসলেন; আর এভাবে হাদীসের সংগ্রহ আরো সমৃদ্ধ হলো। যা ছিলো উল্লেখিত চারজন ইমামের অনেক পরের ঘটনা। তাই তারা সে সময়ে যতটুকু জানতে পেরেছেন সেটার উপরেই মতামত দিয়েছেন।

এখন আপনি বলতে পারেন ভাই জাকির, আপনি কি ইমাম আবু হানিফার চেয়ে বেশি জ্ঞানী? ভাই জাকির, নিজেকে ইমাম শাফেয়ীর চেয়ে জ্ঞানী মনে করেন না কি? (আল্লাহ তাদের দুজনকে শান্তিতে রাখুন)। আমি বলবো- না, মোটেও না। আমি নিজেকে কখনই তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী মনে করি না। তাদের তুলনায় আমি কিছুই না। তারা নবীজী (সাঃ)-এর অনেক কাছে ছিলেন। তাদের জ্ঞান আমাদের সাথে কোনোভাবে তুলনাই চলে না। জীবিত কোনো মানুষের জ্ঞানের সাথে তাদের জ্ঞানের তুলনা চলে না।

তবে বুঝতে হবে যে, হাদীস সংগ্রহ করার কাজ সেই সময়েও চলছিলো। তাই এই চারজন ইমামও বলেছেন, আর কোনো মুসলিমই বলতে পারবে না যে, সে সবগুলো সহীহ হাদীস জানে।

আর এখনকার সময়টা হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ; এখন অনেক সহজ। সেই সময়ে অর্থাৎ ইমামদের সময়ে কোনো হাদীস সংগ্রহ করতে হয়তো যেতে হতো কয়েকশ কিলোমিটার অথবা কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে। আর তা লিখে রাখতে হতো চামড়ার বা ছোট কোনো কাপড়ে অথবা গাছের ছালে। সেই সময়

ফটোস্ট্যাট মেশিন ফিলো না; আর এখন ফটোস্ট্যাট মেশিন আছে, ফ্যাক্স আছে, ই-মেইল আছে যার মাধ্যমে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ফ্যাক্স করতে পারেন, ই-মেইল করতে পারেন যেটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে যাবে। তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এতো উন্নত ছিলো না; আর এখন সবগুলো সহীহ হাদীস মাত্র একটি সিডিতে পেতে পারেন। পূর্ণ বুখারী, পূর্ণ মুসলিম একটি ডিস্কে পেতেও আপনার কোনো সমস্যা নেই। আমাদের প্রতিষ্ঠানে ১০ লাখ হাদীস মাত্র ১ সিডিতে কপি করা আছে এবং এখানে ভাগ করা আছে সহীহ, যয়ীফ, মওযু।

যেহেতু এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ তাই আমরা অনেক সহজেই হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার জানতে পারি যা সে আমলে মোটেও সহজ ছিলো না।

মনে করুন, এখন একজন ছাত্র সে পাস করলো বিএসসি (ব্যাচেলর অব সাইন্স)। সে এখন বিজ্ঞানে আইজ্যাক নিউটনের চেয়ে অনেক বেশি জানে। আইজ্যাক নিউটন হলেন পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী। মাইকেল এইচ হার্ট একটি বই লিখেছেন ‘দি হান্ড্রেড’ (পৃথিবীর সেরা একশ’ জন) নামে। এই বইতে তিনি এক নম্বরে স্থান দিয়েছেন আমাদের নবীজী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এবং দুই নম্বরের স্থান দিয়েছেন স্যার আইজ্যাক নিউটনকে।

যে কেউ কি বিএসসি পাস করার পর বলবে যে, আমি স্যার আইজ্যাক নিউটনের চেয়ে বেশি জানি? সে হয়তো এমন অনেক কিছু জানেন যা আইজ্যাক নিউটন জানতেন না; তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আইজ্যাক নিউটনের চেয়ে বেশি জ্ঞানী তা সে অবশ্যই দাবী করতে পারবে না। কারণ বিজ্ঞানে আইজ্যাক নিউটনের ব্রেন ছিলো অসাধারণ; এমনকি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানীদেরও সে ব্রেন নেই। তবে তার সময়ে বিজ্ঞান জানার রিসোর্স খুব কম ছিলো। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তার অবদান অভূতপূর্ব।

আর এজন্য তাকে বলা হয়েছে ইতিহাসের সেরা বিজ্ঞানীদের একজন। তবে বর্তমানের একজন বিএসসি গ্রাজুয়েট নিউটনের চেয়ে বেশি জানে; কারণ এখন জানার রিসোর্স বেশি যা তাকে অল্প পরিশ্রম আর কম ব্রেনেও বেশি জানতে সাহায্য করেছে। বর্তমানের একজন বিএসসি, সে নিউটনের সূত্রগুলোও জানে, তার কারেকশনগুলোও জানে। নিউটনের থিউরিতে কিছু ভুল ছিলো যা অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এসে সে সকল ভুল শুধরে দিয়েছেন। এ কারণে বর্তমানের একজন

বিএসসি গ্রাজুয়েট নিউটনের চেয়ে হয়তো বেশি জানে, তাই বলে সে কিন্তু নিউটনের চেয়ে বড় বিজ্ঞানী হয়ে যাচ্ছে না।

একইভাবে আমরা বর্তমান সময়ে হাদীসগুলো খুব সহজেই পেতে পারি; কারণ, ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ীসহ বিশিষ্ট হাদীস সংকলকগণ হাদীস সংগ্রহ করে আমাদের পরিশ্রমকে কমিয়ে দিয়ে আমাদেরকে অল্প পরিশ্রমে অনেক হাদীস জানার ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। তারা অত্যন্ত পরিশ্রম আর মেহনতের সাথে সহীহ হাদীস, যয়ীফ হাদীস ও মাওযু হাদীসগুলো আলাদা করে গেছেন; যার কারণে কোনটি সহীহ আর কোনটি মাওযু হাদীস তা জানা আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে। আর এ ব্যাপারগুলো আমাদের জন্য আরো সহজ হয়েছে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে। তাই বলে আমরা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ বিশিষ্ট জ্ঞানীদের চেয়ে বেশি জানি তা কিন্তু নয়। আমরা অবশ্যই তাদের চেয়ে বেশি জানি না। আমি এ দাবী করবো না এবং অন্য কোনো মুসলিমও এ দাবী করবে না।

মূলত বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা এগুলো বেশি জানি তথ্য প্রবাহ বেশি হওয়ার কারণে। আমি এ বিষয়টি আপনাদেরকে পরিষ্কার করেই বললাম। আর একারণেই বলেছিলাম যে, বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর। আমরা চারজন ইমামকেই শ্রদ্ধা করি আর তাদের সবাইকে আমরা ভালোবাসি।

আল কুরআনে ঐক্যের ডাক

মুসলিম উম্মারহ’র একতার জন্য যে সমাধানটা তা আমাদের কাছেই আছে। বক্তব্যের শুরুতেই যে আয়াতটা বলেছিলাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন, *(সূরা-আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত- ১০৩)* -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا-

অর্থ: “তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা’র রজ্জু কোনটা? আল্লাহর রজ্জু হলো মহাগ্রন্থ ‘আল কুরআন’। আল্লাহ বলেছেন- তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।

এখানে কেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? দ্বিগুণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর পবিত্র কুরআনের *(সূরা-নিসা, অধ্যায়-৪, আয়াত- ৫৯)* -এ বলা হয়েছে-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول-

অর্থ: “আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাঃ)-কে মেনে চলো।”

আল্লাহ আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন। অনেক স্থানেই তিনি এ কথাগুলো বলেছেন। সব মিলিয়ে পবিত্র কুরআনের ২০টিরও বেশি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول-

অর্থ: “আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাঃ)-কে মেনে চলো।”

সূরা আলে ইমরানের ৩২, সূরা আলে ইমরানের ১৩২, সূরা নিসার ১৩, সূরা নিসার ৫৯, সূরা নিসার ৬৯, সূরা নিসার ৮০, সূরা তাওবার ৭১, সূরা নুরের ৪৭, সূরা নুরের ৭২, সূরা নুরের ৫৪, সূরা আহযাবের ৩১, সূরা আহযাবের ৩৩, সূরা মুহাম্মদের ৩৩, সূরা ফাতাহ’র ১৭, সূরা হুজরাতের ১৪, সূরা মুজদালাহ’র ১৩ এবং সূরা তাগাবুনের ১২, এরকম ২০টির বেশি স্থানে আল্লাহ বলেছেন।

(সূরা-নুর, অধ্যায়-২৪, আয়াত- ৫৪) -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول-

অর্থ: “আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাঃ)-কে মেনে চলো।”

তাহলে আল্লাহর রজ্জু হচ্ছে- আল্লাহর কুরআন ও নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সহীহ হাদীস। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে বলেছেন- “তোমরা সবাই

আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধরো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।" আর এই রজ্জু হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন- *(সূরা-আনআম, অধ্যায়-৬, আয়াত- ১৫৯)* -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ-

অর্থ: "যারা দ্বীন সম্পর্কে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো দায়িত্ব তোমার নয়।"

আল্লাহ তায়ালা নবীজী (সাঃ)-কে বলেছেন, তাদের কোনো দায়িত্ব তোমার নয়।

তার মানে ইসলাম ধর্মে নানা মত ও পথের প্রচলন করা ও তৈরি করা নিষিদ্ধ, এটা হারাম। আর পবিত্র কুরআনে এই কথাটা অনেকবার বলা হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

(সূরা-রোম, অধ্যায়-৩০, আয়াত- ৩১ ও ৩২) -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

অর্থ: "মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না, যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শরিক বানিয়ে উপাসনা করে। আর তাদের মতো হইও না যারা দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয় আর প্রত্যেক দল উল্লাস করে যে, তারা সত্যের পথে আছে।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা রোমের ৩১ ও ৩২ নং আয়াতে বলেছেন যে, তাদের মতো হইও না যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শরিককে উপাসনা করে। তাদের মতো হইও না যারা দ্বীনে মতভেদ মতভেদ সৃষ্টি করে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয় আর প্রত্যেক দল উল্লাস করে যে, তারাই সঠিক ও সত্যের পথে আছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে এ কথাটা আবার বলেছেন- *(সূরা-মুমিনুন, অধ্যায়-২৩, আয়াত-৫৩)* -এ উল্লেখ করা হয়েছে,

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

অর্থ: "তারা প্রত্যেকেই উল্লাস করে যে, আমরাই সত্যের পথে আছি।"

এছাড়া পবিত্র কুরআনের *(সূরা-আস শুরা, অধ্যায়-৪২, আয়াত- ১৩ ও ১৪)* – এ উল্লেখ করা হয়েছে,

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ- وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ-

অর্থ: "তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো আর কোনো রকম মতভেদ সৃষ্টি করো না। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে সমভেদ করেছে।"

পবিত্র কুরআনে এরকম আরো অনেক আয়াতে বলা হয়েছে- তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইও না।

তাহলে ইসলাম ধর্মে মতভেদ সৃষ্টি করা হারাম। এটা নিষিদ্ধ। আমি চারটা রেফারেন্স উল্লেখ করলাম; কিন্তু এরকম উদাহরণ আরো অনেক আছে।

তবে যদি কোনো মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনি কী? আপনার মাযহাব কী? তখন কেউ বলবে আমি হানাফী, কেউ বলবে আমি শাফেয়ী, কেউ বলবে আমি হাম্বলী, কেউ বলবে আমি মালিকী, কেউ বলবে আমি সালাফী, কেউ বলবে আমি আহলে হাদীস।

আমাদের প্রিয় নবী কী ছিলেন? তিনি কী হানাফী ছিলেন? নাকি ছিলেন মালিকী, নাকি শাফেয়ী ছিলেন অথবা ছিলেন হাম্বলি, নাকি ছিলেন আহলে হাদীস, নাকি ছিলেন সালাফী? তিনি কী ছিলেন? আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন।

(সূরা-আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-৬৭) -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا-

অর্থ: "ইবরাহীম (আ) ইহুদী অথবা খ্রিস্টান ছিলেন না; তিনি ছিলেন আত্মসমর্পণকারী মুসলিম।"

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ***(সূরা হজ্জ, অধ্যায়-২২, আয়াত-৭৮)*** -এ বলেছেন-

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ

অর্থ: "তোমরা জিহাদ করো আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তোমরা জিহাদ করো অধ্যবসায় ও শৃঙ্খলার সাথে। আল্লাহ তোমাদের মনোনীত করেছেন, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। তিনি তোমাদের জন্য যে দ্বীন মনোনীত করেছেন সে দ্বীন হচ্ছে ইবরাহীমের দ্বীন আর তিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন মুসলিম, আগের সকল কিতাবে এবং এই কিতাবেও। সুতরাং নামায আদায় করো এবং যাকাত দাও।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে- আল্লাহ আমাদের মুসলিম নামে ডেকেছেন, আর আমাদের জন্য এই মুসলিম নামই নির্ধারণ করেছেন আগেকার আসমানী কিতাবে এবং এই (কুরআন) কিতাবেও। এছাড়াও আপনারা কুরআনের আরো অনেক আয়াতে দেখবেন, আল্লাহ আমাদের সম্বোধন করেছেন মুসলিম বলে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন ***(সূরা-ফুসসিলাত, অধ্যায়-৪১, আয়াত-৩৩)*** -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: “সেই ব্যক্তির চেয়ে আর কে উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করে আর বলে আমি তো মুসলিম (আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী)।

আল্লাহ বলেননি যে আমরা হানাফী বা শাফেয়ী বা হাম্বলী বা মালিকী বা সালাফী অথবা আহলে হাদীস।

আল্লাহ এ কথা আবার *(সূরা যুমার, অধ্যায় ৩৯,আয়াত ১২)* -তে উল্লেখ করেছেন-

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ [٣٩:١٢]

অর্থ: “আমি আদৃষ্ট হয়েছি যাতে করে আমি প্রথম মুসলিম হতে পারি।”

অর্থাৎ, বলো আমি সেই প্রথম কয়েকজন মুসলিমের মধ্যে একজন যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী।

আমার বক্তব্যের শুরুর দিকে দাওয়ার মাস্টার কী (চাবি) সর্ম্পকে বলেছিলাম। দাওয়ার মাস্টার কী হচ্ছে-

(সূরা-আলে ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-৬৪) -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

অর্থ: “বলো, ‘হে কিতাবের অনুসারীগণ! এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই।”

প্রথম সাদৃশটা কী? তা হচ্ছে-

أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

অর্থ: “আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করি না। কোনো কিছুকেই তার সাথে শরীক করি না।

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

অর্থ: আমাদের কেউ কাকেও আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ করি না।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়,

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অর্থ: যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো, অবশ্যই আমরা মুসলমানরা আল্লাহর কাছে আমাদের ইচ্ছাকে সমর্পন করলাম।"

যখন আমরা কোনো অমুসলিমের সাথে কথা বলি তখন কোনো সমস্যা হলে বলবো, "তোমরা সাক্ষী থাকো, অবশ্যই আমরা মুসলমানরা আল্লাহর কাছে আমাদের ইচ্ছাকে সমর্পনকারী।"

এরপর সূরা হজ্জের ৭৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ আমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম'। সব মিলিয়ে পবিত্র কুরআনের ৭টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের বলেছেন, নিজেকে মুসলিম বলো, বলো তোমরা মুসলিম।

পবিত্র কুরআনের সূরা ফুসসিলাতের ৩৩, সূরা যুমারের ১২, সূরা আলে ইমরানের ৬৪, সূরা বাকারার ১৩৬, সূরা আম্বিয়ার ১৩৮, সূরা কাসাসের ৫৩ ও সূরা আনকাবূতের ৪৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। (পবিত্র কুরআনের ৭টি জায়গায়) আল্লাহ বলেছেন, "বলো যে, তোমরা মুসলিম।"

তাহলে মহভেদটা আসছে কোথা থেকে?

নিজেদের সম্পর্কে চার ইমামের মূল্যায়ন

তারা চারজনই অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বিখ্যাত ইমাম। আমরা তাদের ভালোবসি, তাদেরকে সম্মান করি, সবাইকে শ্রদ্ধা করি। তারা বিখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞ।

কিন্তু আমরা যদি এই ইমামগণের জীবন কাহিনী পড়ি, তাহলে তাদের কথাগুলো আমরা বুঝতে পারবো সত্যিকারভাবে।

যদি আপনি ইমাম আবু হানিফার জীবন কাহিনী পড়েন, তিনি আগে এসেছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করে ৭০১ খ্রিস্টাব্দে আর ইনতিকাল করেছেন ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ১৫০ সালে)। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, *(আবু ইউসুফের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি ইমাম আবু হানিফার একজন ছাত্র) হে ইয়াকুব! তারা অভিশপ্ত হোক যারা আমার মতামতগুলো লিখে রাখে। কারণ, আমি আজকে কিছু বললাম, কালই হয়তো সেটা বাদ দিতে পারি। হয়তো আগামীকাল একটা মতামত দেব আর পরের দিনই আবার সেটা বাতিল করবো।*

তাহলে ইমাম আবু হানিফা (র) আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন; তিনি তার মতামত লিখে রাখাকে উৎসাহিত করেননি, যদি না সেটার ব্যাপারে সবাই একমত হয়। যদি সব বিশেষজ্ঞ আর ছাত্ররা একমত হয় তাহলে তিনি সে ক্ষেত্রে লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়া তার কোনো মতামত তিনি লিখে রাখা পছন্দ করতেন না।

আর ইমাম আবু হানিফার অন্য একজন ছাত্র ইমাম যুফারের কথা অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন, *"আমাদের সাবধান থাকতে হবে। আমরাতো মানুষ, আমাদের মতামত ভুল হয়ে যেতে পারে। আমি আজকে যে মতটা দিয়েছি কাল সেটা বদলিয়েও দিতে পারি। আমি লোকজনকে নিষেধ করি কোনো প্রমাণ ছাড়া মতামতটা প্রচার করতে, যে মতামতটা আমি দিয়েছি।"* আবু হানিফা (র) বলেছেন, কোনো প্রমাণ ছাড়া মানুষ যেন আমার মতামতটা প্রচার না করে। আমার ফতওয়া যেন প্রচার না করে। তার মানে যদি আপনি কোনো প্রমাণ না পান তাহলে ইমাম আবু হানিফার মতামতগুলো প্রচার করবেন না।

তারপর আপনারা দেখবেন, ইমাম ইবনে আব্দুল বার, যিনি একজন শ্রদ্ধেয় ইমাম। তিনি লিখেছেন- *"ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন, সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব। যদি তোমরা সহীহ হাদীস খুঁজে পাও তাহলে সেটাই মাযহাব। যদি তোমরা একটা সহীহ হাদীসও পাও তাহলে সেটাই আমার জীবন দর্শন, সেটাই আমার মাযহাব।"*

আর ইমাম আবু হানিফার একজন ছাত্র ইমাম মুহাম্মদের কথা অনুযায়ী, ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন, *“যদি আমার কোনো ফতওয়া আমার কোনো একটা মতামত আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধে যায় এবং তা রাসূল (সাঃ)-এর কথার বিরুদ্ধে যায় তাহলে আমার সে মতামত বাতিল করে দাও।”*

তার মানে যদি ইমাম আবু হানিফার এমন কোনো ফতওয়া পান যেটা আল্লাহর কুরআন আর নবীজী (সাঃ)-এর হাদীসের বিরুদ্ধে যায় তাহলে সেই ফতওয়া বাতিল করে দিন।

আর লোকজন যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে কোনো মহিলাকে যদি দুর্ঘটনাবশত স্পর্শ করি তাহলে কি আমার অযু ভাঙ্গবে? অথবা কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, সূরা ফাতিহা শেষ হলে আমরা শব্দ করে আমিন বলবো কি বলবো না? তখন আমি বলি, সূরা ফাতিহা শেষ হলে আমি শব্দ করে আমিন বলি। ইমাম ফজর, মাগরীব বা এশার নামাযে যখন বলে- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম) আমি তখন শব্দ করে আমিন বলি। আর এ কারণেই আমি একজন পাক্কা হানাফী। কারণ, ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন, যদি দেখো আমার কোনো মতামত, আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও। তাই আমি ইমাম আবু হানিফা (র)-এর সংক্রান্ত মতামত বাতিল করছি যে, তিনি বলেছেন- শব্দ করে আমিন বলো না আর আমি জোরে করে আমিন বলছি। এই কারণেই আমি একজন পাক্কা হানাফী। হানাফী শব্দের অর্থ- যে ইমাম আবু হানিফার শিক্ষাকে অনুসরণ করে। তাই আমি বলবো, আমি একজন পাক্কা হানাফী, ১০০% হানাফী; অন্যান্য হানাফীগণ হয়তো ৬০% বা ৭০%। সহীহ হাদীস হচ্ছে আমার মাযহাব।

আর ইবনে ওয়াহহাব (র)-এর কথা অনুযায়ী, তিনি বলেন- একদিন কিছু লোক ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করলো যে, অযু করার সময় কি আমাদেরকে পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে খুব ভালো করে পানি পৌঁছিয়ে খিলাল করে পরিষ্কার করতে হবে? ইমাম মালিক (র) বললেন, নবীজী এটা করতেন না। তাই তা করার প্রয়োজন নেই। এরপর যখন সময় চলে গেল ইবনে ওয়াহহাব ইমাম মালিককে একটি হাদীসের উদ্বৃতি দিলেন যেখানে বলা হয়েছে- ‘আমাদের নবীজী অযু করার সময় তার আঙ্গুলের ভেতরেও ভালো করে পরিষ্কার করতেন।’ ইমাম মালিক (র)

বললেন, ঠিক; এটাতো যে, অযু করার সময় কি আমাদেরকে পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে খুব ভালো করে পানি পৌঁছিয়ে খিলাল করে পরিষ্কার করতে হবে? তিনি অবশ্যই বলতেন 'হাঁ', ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। এখানে তিনি মতামতটা বদলে ফেললেন।

তাহলে সহীহ হাদীসে যা বলা হয়েছে, তার মতামতটা সে অনুযায়ী হবে।

আর ইমাম মালিক (র) বলেছেন, "আমিতো একজন মানুষ! আমার ভুল হতে পারে। তবে মাঝে মধ্যে আমার কথা সঠিক। তবে আমার কোনো মতামত যদি আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের বিরুদ্ধে যায় তখন আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও।" একই কথা।

মালিকীরা যখন নামায আদায় করে তারা হাত দুটো ঝুলিয়ে রাখে। কিন্তু যদি আমরা আবু দাউদের হাদীস পড়ি, আবু দাউদের ১নং খণ্ড ৭৫৫ ও ৭৫৭ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- *"তোমরা হাত বাঁধো নাভীর নিচে।"* তবে ইমাম আবু দাউদ এ দুটোকে যয়ীফ হাদীস বলেছেন।

আবু দাউদের ১ নং খণ্ড ৭৫৬ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- *"তোমরা নাভীর ওপর হাত বাঁধো।"* এটার ভিত্তি যয়ীফ হাদীসটার চেয়ে বেশ শক্ত অর্থাৎ এটার ভিত্তি উক্ত দুটোর চেয়ে সবল। কিন্তু পরের হাদীসটা আবু দাউদের ১ নং খণ্ড ৭৫৮ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- *"নামায আদায় করার সময় তোমরা হাত বাঁধবে তোমাদের বুকের ওপর।"* যদিও এটা মুরসাল হাদীস কিন্তু এটাকে আরো বেশি সবল হাদীস বলা হয়েছে। মুরসাল মানে এখানে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তাফসীরে বলা হয়েছে- এটা অন্যান্য হাদীসের চেয়ে বেশ মযবুত হাদীস।

আপনারা যদি ইবনে হুযাইফার হাদীস পড়েন তাহলে দেখবেন, সেখানে বলা হয়েছে- *"নবীজী (সাঃ) নামাযের সময় বুকের ওপর হাত বাঁধতেন।"* এটাও একটা মুরসাল হাদীস; হবে অন্যান্য হাদীসের পাশাপাশি এটাকেও শেখ নাসির উদ্দিন আলবানী (র) সহীহ হাদীস হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

তাহলে নামাযের সময় কোথায় হাত রাখবেন সে ব্যাপারে মযবুত হাদীস হচ্ছে নামাযে "বুকের ওপর হাত রাখবেন"। তাই আমি যখন নামায পড়ি তখন আমার হাত রাখি বুকের ওপর। আর একারণেই বলেছি যে, আমি একজন পাক্কা মালিকী।

কারণ, ইমাম মালিক বলেছেন, যদি দেখো আমার কোনো মতামত, আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও।

এখন যদি মালিকীগণ বলেন, ইমাম মালিক (র) বলেছেন, তোমরা নামাযের সময় বুকের ওপর হাত রাখো; যদিও তিনি বলেননি তবুও ধরে নিলাম যে, তিনি বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন যদি আমার কোনো মতামত, আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও। তাই আমি ফতওয়াকে বাদ দিয়েছি। নামাযের সময় আমি আমার হাত রাখি বুকের ওপরে আর সেজন্য আমি ১০০% মালিকী এতে কোনো ফাক নেই। এক্ষেত্রে অন্যান্য মালিকীগণ হয়তো ৬০% বা ৭০% কিন্তু আমি ১০০% মালিকী, সম্পূর্ণ মালিকী।

আপনারা যদি ইতিহাস পড়েন তাহলে দেখবেন, আব্বাসীয় শাসনামলে আব্বাসীয় খলিফাগণ যখন শাসন করতেন তখন আবু জাফর আর খলিফা হারুনুর রশিদ ইমাম মালিকের ফতওয়াগুলো ছাপাতে চেয়েছিলেন; যেটাকে বলা হয় মুয়াত্ত-ই মালিক। কিন্তু তিনি বললেন, না; কারণ নবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন। আমি যতটুকু জানি তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত দেই। যেহেতু নবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছেন, তাই আমি জানি না যে, আমি যে ফতওয়া দেই তা-ই শতভাগ সঠিক। অর্থাৎ তিনি তার মুয়াত্তা লেখার জন্য খলিফাগণকে অনুমতি দেননি এবং তার সেই ফতওয়াকে সেই দেশের আইন বলে মেনে নিতে রাজি হননি।

এখন চিন্তা করুন, ইমাম মালিক (র) ব্যাপারটাকে এভাবেই দেখতেন। আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন।

এরপর আসেন ইমাম শাফেয়ী (র)। তিনি ইমাম মালিকের ছাত্র ছিলেন আর ইমাম আবু হানিফার একজন ছাত্রের ছাত্র ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, যদি দেখো আমার কোনো মতামত বা ইমাম মালিকের মতামত অথবা ইমাম আওযায়ীর মতামত, তাহলে আগে দেখো যে, সেটা কোথা থেকে এসেছে; সেটার উৎসটা কোথায়। তিনি বলেছেন, আমার মতামত তোমরা অন্ধভাবে অনুসরণ করো

না, চোখ বুঝে আমাকে অনুসরণ করো না। যদি কোনো সহীহ হাদীস খুঁজে পাও তাহলে সেটাই আমার মাযহাব। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব হচ্ছে সহীহ হাদীসের মাযহাব। তিনি বলেছেন, *"যদি দেখো আমার কোনো ফতওয়া কুরআন এবং হাদীসের বিরুদ্ধে যায় তাহলে আমার মতামতটা বাতিল করে দাও।"*

লোকজন যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে অযু অবস্থায় কোনো মহিলাকে স্পর্শ করার ব্যাপারে যে, কোনো মহিলা আমাকে স্পর্শ করলে বা আমি তাকে অযু অবস্থায় স্পর্শ করলে আমার কি অযু ভেঙ্গে যাবে? তাহলে আমি বলবো- না, এতে আমার অযু ভাঙ্গবে না। কারণ, এ ব্যাপারে আবু দাউদ এবং মুসলিমে বেশ কিছু সহীহ হাদীস রয়েছে যে, অযু অবস্থায় কোনো মহিলাকে স্পর্শ করলে অযু ভাঙ্গবে না। আর এটা বলার পরও আমি একজন পাক্কা শাফেয়ী। তার কারণ, ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, "যদি তোমরা দেখো আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের হাদীসের বিরুদ্ধে যায় তাহলে আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও।" আর এ কারণে আমি একজন পাক্কা শাফেয়ী। অন্যান্য শাফেয়ীরা হয়তো ৭০% বা ৮০% শাফেয়ী, হবে ১০০% নয়; কিন্তু আমি একজন পাক্কা শাফেয়ী।

আর আপনারা ইতিহাস পড়লে দেখবেন, ইমাম শাফেয়ী (র) বাগদাদে অবস্থান করা অবস্থায় তিনি ফতওয়া নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন যার নাম ছিলো 'আল হুজ্জা'। পরবর্তীতে তিনি একবার মিশরে গিয়ে আবার ফিরে এলেন এবং তারপর তিনি ইমাম লায়েক ইবনে সা'দ এর ছাত্রদের অধীনে পড়াশোনা করলেন। এ সময় অনেক বিষয়েই তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়, যার কারণে তিনি নতুন একটি বই লিখেন যার নাম হা'লুম। অর্থাৎ ইমামা শাফেয়ী প্রথমে একটি বই লিখেন অতপর ইবনে সা'দের ছাত্রদের নিকট পড়ার পর তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেলে আরো একটি বই লিখেন।

মানুষের অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে যে, ইমাম মাত্র চারজন। না, ইমাম মাত্র চারজনই নয় বরং আরো অনেক ইমাম ছিলেন যারা অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ছাত্রদের ব্যাপক প্রচারের কারণে তারা চারজন প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

উক্ত চারজন ইমাম ছাড়াও আরো অনেক ইমাম ছিলেন যেমন, ইমাম লায়েক ইবনে সা'দ। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তারপর তিনি

বলেন, ফিকহ বিষয়ে ইমাম লায়েক ইবনে সা'দের জ্ঞান ইমাম মালেকের জ্ঞানের অনেক উর্ধ্বে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র) এটা বলতে পারলেও আমরা বলতে পারি না।

চতুর্থ ইমাম হচ্ছেন- ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল। তিনিও ফতওয়ার ব্যাপারে একই মত পোষণ করতেন। এমনকি মতামতের ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আরো বেশি কঠিন ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন কোনো ব্যাপারে সবাই একমত হলে তবেই সেগুলো লিখো; একমত না হলে লিখো না। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর চেয়েও আরো কঠোর ছিলেন। *তিনি বলতেন "আমার কোনো মতামতই লিখো না। যদি আমার মতামত যাচাই করতে চাও অথবা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেকের মতামত যাচাই বাছাই করতে চাও তাহলে সেগুলো উৎস সর্ম্পকে খোঁজ নাও। আর যদি দেখো আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের কোনো হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাহলে আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও।"*

এ কারণেই আমি বলছি, আমি একজন পাক্কা হাম্বলি। হাম্বলি মানে তো যারা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে অনুসরণ করে চলে। আমি ইমাম হাম্বলকে অনুসরণ করি কারণ তিনি বলেছেন, যদি দেখো আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের কোনো হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাহলে আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও। আমি পুরো ১০০% হাম্বলি। অন্যান্য হাম্বলিরা হয়তো ৭০% বা ৮০% হাম্বলি, তবে ১০০% নয়; কিন্তু আমি একজন পাক্কা হাম্বলি।

তাহলে যদি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে শান্তিতে রাখুন) যা বলেছেন সেগুলো মানলে সে হানাফী; তাহলে আমি পাক্কা হানাফী, ১০০% হানাফী। যদি বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) যা বলেছেন সেগুলো মানলে সে শাফেয়ী; তাহলে আমি পাক্কা শাফেয়ী, ১০০% শাফেয়ী। যদি ইমাম মালিক (র)-কে অনুসরণ করলে মালিকী হওয়া যায় তাহলে আমি পাক্কা মালিকী, ১০০% মালিকী। আর যদি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-কে অনুসরণ করলে হাম্বলি হওয়া যায় তাহলে আমি পাক্কা হাম্বলি, ১০০% হাম্বলি।

কারণ, এই চারজন ইমামই বলেছেন, *“যদি দেখো আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের কোনো হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাহলে আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও।”*

মাযহাব কী?

দেখুন, এই চারজন ইমামের অনুসারী এবং এই মাযহাবগুলো আসলে কী? মাযহাব শব্দের অর্থ কী? মাযহাব শব্দের অর্থ হচ্ছে- পথ অথবা যাওয়ার রাস্তা। মাযহাবের আর একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে- ‘সুন্নাহ’। সুন্নাহ শব্দের অর্থ ‘পথ’। নবীজীর সুন্নাহ মানে নবীজীর দেখানো পথ।

তাহলে এই চারজন ইমামের মাযহাব ছিলো আমাদের নবীজী (সাঃ)-এর মাযহাব। চারজন ইমামই বলেছেন, *যদি কোনো সহীহ হাদীস পাও তাহলে আমার ফতওয়া বাদ দাও।* তাহলে দেখা যাচ্ছে- উক্ত চারজন ইমামের মাযহাব ছিলো আমাদের রাসূলে (সাঃ)-এর মাযহাব।

ইমাম আবু হানিফা (র) আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি নতুন করে হানাফী মাযহাব নামে কোনো কিছু চালু করেন নি। ইমাম মালেক (র) মালিকী মাযহাব নামে নতুন করে কোনো কিছু চালু করেন নি। তেমনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) হাম্বলি মাযহাব নামে নতুন করে কোনো কিছু চালু করেন নি। তারা সবাই বলেছেন, যদি কোনো সহীহ হাদীস পাও তাহলে আমার ফতওয়া বাদ দাও।

অর্থাৎ এই চারজন ইমামের মাযহাবই ছিলো আমাদের রাসূল (সাঃ)-এর মাযহাব। তারা সবাই রাসূলের মাযহাব অনুসরণ করেছেন।

খ্রিস্টানদের মধ্যেই এরকম একটি ভুল ধারণা চালু আছে। যিশুখ্রিস্ট খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে আসেননি; তিনি এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে। একইভাবে এই চারজন ইমামই এসেছিলেন আমাদের জ্ঞান দিতে; আমাদের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে। তারা নবীজী (সাঃ)-এর মাযহাব ছাড়া অন্য কোনো মাযহাবে ছিলেন না।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ***(সূরা-নিসা, অধ্যায়-৪, আয়াত-৫৯)***-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

অর্থ: "আল্লাহকে মানো এবং তার রাসূলকে মানো এবং যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী এবং জ্ঞানের অধিকারী তাদেরকে।........."

তবে আয়াতটি এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। এরপর বলা হয়েছে-

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থ: "যদি তোমাদের মধ্যে মতভেদ থাকে তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে ফিরে যাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।"

তাহলে যাদের জ্ঞান আছে- ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের শান্তিতে রাখুন) প্রমুখ জ্ঞানীদের মতভেদ থাকলে আল্লাহ এবং রাসূলের কাছে ফিরে যাবেন। আর এ ব্যাপারে চারজন ইমাম একই কথা বলেছেন, *"যদি দেখো আমার কোনো ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের কোনো হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাহলে আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও। "*

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ***(সূরা-নিসা, অধ্যায়-৪, আয়াত-৫৯)***-এ একই কথা বলেছেন-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থ: "আল্লাহকে মানো এবং তার রাসূলকে মানো এবং মানো যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী এবং জ্ঞানের অধিকারী তাদেরকে। যদি তোমাদের মধ্যে মতভেদ থাকে তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে ফিরে যাও যদি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখো।"

কোনো রকম মতভেদ থাকলে আমরা কী করবো? আল্লাহ এবং রাসূলের কাছে ফিরে যাবো। ব্যাপারটা খুবই সহজ। তবে কিছু মুসলিম আছে, যারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারে- “ভাই জাকির! আপনি বললেন, ভালো। যেসব লোকের কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান আছে তাদের জন্য এটা জানা সহজ যে, কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। কোনটা সহীহ হাদীস আর কোনটা যয়ীফ হাদীস। কিন্তু সাধারণ মুসলিমরা বুঝতে পারে না যে কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। তাহলে তাদের উপায় কী? প্রশ্নটা খুবই সুন্দর।

তারা বলে এজন্য আমরা তাকলীদ করি তথা অন্য কাউকে অনুসরণ করি।

তাকলীদের স্বরূপ

আমি তাদের তখন বলি তাকলীদ মানে কী? দেখুন, কোনো ইমামের অনুসরণ করলে তাকে তাকলীদ বলা হয় না বরং সেটাকে বলে মুকাল্লিদ। যদি দেখেন আপনার ইমাম ভুল করেছেন তারপর সেটা শুধরে দিলেন; তখনও আপনি মুকাল্লিদ থাকবেন।

যেমন ধরুন, আপনার মায়ের হার্টের সমস্যা আছে, এজন্য ডাক্তার লাগবে। এমতাবস্থায় আপনি কার কাছে যাবেন? আপনিতো আর যার তার কাছে যাবেন না; যাবেন একজন হার্ট স্পেশালিস্ট-এর কাছে। আপনি ভেবে দেখবেন, এমবিবিএস? না, এমডি'র কাছে? সে কীসের উপর এমডি ব্রেনের উপর? না, সেকি হার্টের উপর এমডি? যদি হা হয় তাহলে তার কাছে যাবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার মায়ের হার্টের সমস্যা কারণে আপনি যার তার কাছে যাবেন না; যাবেন একজন ডাক্তারের কাছে। এই ডাক্তার আবার যেকোনো একজন ডাক্তার নয়; সে হার্ট স্পেশালিস্ট। একজন হার্ট বিশেষজ্ঞের নিকটে গেলে তবেই আপনার সমস্যার সমাধান হতে পারে। অর্থাৎ আপনি নির্ধারিত সমস্যার সমাধানে ঐ বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তার কাছেই যাবেন; অন্য কারো কাছে যাবেন না। আপনি আগে রিসার্চ করে তারপর ডাক্তারের কাছে যাবেন। যে কোনো একজন ডাক্তারের কাছে যাবেন না। রাস্তায় যদি একজন লোক বলে যে, আপনার মায়ের হার্টের সমস্যা? তাহলে এই কাজ করুন।

এমতাবস্থায় আপনি কি তার কথা শুনবেন? না, শুনবেন না। কারণ, তিনি সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন।

একইভাবে তৃতীয় ক্যাটাগরি; অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূলকে মানো। এরপর হচ্ছে- তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী।

আপনি রিসার্চ করবেন। একজন বিশেষজ্ঞ একটি মত দিলে সেটা সঠিক হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে; আপনি সবকিছু যাচাই-বাছাই করতে পারবেন না।

ধরুন, দশজন বিশেষজ্ঞর মত শুনলেন। আপনি বললেন যে, প্রথম বিশেষজ্ঞ প্রায় ৩০/৪০টি রেফারেন্স দিয়েছেন, তার মধ্যে আমি ২০টি যাচাই-বাছাই করে দেখেছি। ২০টিই কুরআন এবং সহীহ হাদীসের রেফারেন্স। তাহলে ২১ নম্বরটা আর যাচাই-বাছাই করতে হবে না।

তারপর দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞকে দেখলেন। যাচাই-বাছাই করে দেখলেন তার টার কিছু সহীহ হাদীস আর কিছু যয়ীফ হাদীস। তৃতীয় বিশেষজ্ঞর বলা অধিকাংশ কথাই ভিত্তিহীন। কোনো সহীহ হাদীস নেই। সহীহ বুখারী শরীফে ৭ হাজারেরও বেশি সহীহ হাদীস আছে সেখানকার একটির সাথেও মিলে না।

তাহলে অনেক বিশেষজ্ঞই আছেন, কিন্তু আপনি যাচাই-বাছাই করে দেখবেন। আপনি দেখলেন, প্রথম বিশেষজ্ঞ সঠিক কথা বলেন। তার কথাগুলো কুরআন-হাদীসের রেফারেন্স ছাড়া বলেন না। আর তার কথাগুলো যাচাই-বাছাই করেও সঠিক পেয়েছেন।

তারপর আপনি তাদের কোনো প্রশ্ন করলেন আর তিনজন বিশেষজ্ঞই মতামত দিলেন। আপনি তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মানবেন প্রথম জনের কথা। কারণ আপনি আগে তিনজনকেই যাচাই-বাছাই করে দেখেছেন এবং প্রথম জনের ২০টি রেফারেন্স আপনি যাচাই করে দেখেছেন যে, তা কুরআন এবং সহীহ হাদীসে রয়েছে। তাহলে তার ২১ নং রেফারেন্সটাও সঠিক হবে। প্রত্যেক মুসলিম বিশেষজ্ঞের দেওয়া মতামতের সবগুলো যাচাই করতে পারবেন না। আপনি এখানে আগে রিসার্চ করে দেখবেন, প্রথম বিশেষজ্ঞকেই মানা উচিত। কারণ, তিনি সব বিষয়ে কুরআন হাদীস নিয়েই কথা বলেন।

মনে করুন চারজন বিশেষজ্ঞ। তাদের প্রথমজনের সবগুলোই সঠিক পেলেন। দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞের কিছু সঠিক আর কিছু ভুল এবং তৃতীয় বিশেষজ্ঞের অধিকাংশই ভুল। তাহলে আপনি রিসার্চ করে বুঝার চেষ্টা করবেন যে, কেমন বিশেষজ্ঞ। অতপর পরবর্তী সমস্যাগুলোর জন্য রিসার্চ না করে প্রথম বিশেষজ্ঞকে মেনে চলেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই। তবে, ধরুন আপনি একজন বিশেষজ্ঞের কথা মানেন; তার উপর রিসার্চ করেছেন। অন্য একজন বিশেষজ্ঞ বললেন প্রথমজন যা বলেছেন তা ভুল, আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারি কুরআন এবং হাদীস দিয়ে; তাহলে প্রমাণটা যাচাই করুন। যদি প্রমাণটা ভুল হয় তাহলে প্রথমজনকেই মেনে চলুন। কিন্তু যদি দেখেন যে, প্রমাণটা কুরআন এবং সহীহ হাদীসে রয়েছে। তাহলে প্রথমটা বাতিল করে দ্বিতীয়টাই মেনে চলুন।

এখানে আরো একটা উদাহরণ দেই। যেমন-ধরুন আমি। আমি যেটা বলি সেটা বক্তব্যের আগে যাচাই-বাছাই করি। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে অনেক তথ্য আছে যেগুলো সবই যাচাই-বাছাই করা হয়নি। তারপরও ভাগভাগ করি। যেমন ধরুন, যদি আমি শেখ নাসির উদ্দীন আলবানির কোনো মতামত শুনি (তিনি কিছুদিন আগে মারা গেছে। আমার মতে তিনি বর্তমান সময়ের সেরা মুহাদ্দিস ছিলেন।) তাহলে আমি তা অনুসরণ করি। কারণ আমি যাচাই-বাছাই করে দেখেছি যে, তিনি মাশাআল্লাহ কুরআন হাদীস অনুযায়ী কথা বলতেন। কিন্তু কেউ যদি ফতওয়া দেন নাসির উদ্দীন আলবানির বিরুদ্ধে আর সেটা কুরআন হাদীস অনুযায়ী না হয় তাহলে নাসির উদ্দীন আলবানির কথাটাকে আমি বাতিল করে দেবো। আমি এটা করতে পারি, কারণ আমি জানি সব মানুষই ভুল করতে পারে। ইমাম আবু হানিফা ভুল করেছেন, ইমাম শাফেয়ী (র) ভুল করেছেন, ইমাম মালিক ও ইমাম হাম্বলি (র)-ও ভুল করেছেন। সুতরাং নাসির উদ্দীন আলবানি (র)-ও ভুল করতে পারেন। তবে তিনি এমন একজন বিশেষজ্ঞ যিনি কুরআন-হাদীস অনুযায়ীই কথা বলেন।

কিন্তু যদি এখানকার একজন সাধারণ লোক আর নাসির উদ্দীন আলবানির কথার মধ্যে মতপার্থক্য হয় তাহলে আমি নাসির উদ্দীন আলবানির কথাই অনুসরণ করবো। তবে বক্তব্যে কিছু বললে আমি সেটা যাচাই-বাছাই করি। কারণ বক্তব্যে যেটা বলি সেটা আমার দায়িত্ব। কিন্তু আমি যদি কোনো মতামত দিতে চাই, আমার পক্ষে সব হাদীস যাচাই-বাছাই করা সম্ভব নয়, কঠিন। সব হাদীস যাচাই-বাছাই করা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন। তাই দেখতে হবে কোন বিশেষজ্ঞের কথা

শুনছেন অথবা কোন লেখকের বই আপনি পড়ছেন বা কোন বক্তার বক্তব্য আপনি শ্রবণ করছেন।

আপনি ক্যাটাগরি অনুযায়ী ভাগ করুন যে, এই বিশেষজ্ঞের কথা ২০% ভুল, এই বিশেষজ্ঞের কথা ৫০% ভুল, আর এই বিশেষজ্ঞের কথা ৭০% ভুল। তারপর যদি আপনার হাতে সময় না থাকে আর প্রথম বিশেষজ্ঞের উপর আপনার ভরসা থাকে তাহলে সবকিছু যাচাই-বাছাই করতে হবে না। যদি হাতে সময় থাকে তাহলে যাচাই-বাছাই করেন তাহলে সেটা তাকলিদ নয়; বরং আপনি যদি আপনার ইমামের কোনো মতামত কেউ ভুল প্রমাণ করা সত্ত্বেও আপনি তা অন্ধভাবে অনুসরণ করেন তাহলে সেটাই তাকলিদ। আমরা তাকলিদ করবো একমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসূলের উদ্দেশ্যে; আর কারো না। أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ব্যাস, খুব সহজ।

এখন আপনি হয়তো বলতে পারেন ভাই জাকির, আপনি বলছেন আপনি কোনো দলাদলি করবেন না; কিন্তু রাসূল (সাঃ) তো বলে গেছেন *"আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩টা আলাদা দল হবে।"* আমি বলবো হ্যাঁ, নবীজী বলেছেন এমনটি হবে; কিন্তু তিনি বলেননি এটা করা উচিত।

আল্লাহ আমাদের দলাদলি করতে নিষেধ করেছেন; তবুও মুসলিমের মাঝে দলাদলি হবে আর এটা নবীজী (সাঃ) জানতেন। তাই তিনি এটা বলেছেন; তিনি বলেননি যে, এটা করা উচিত।

যদি আপনারা সহীহ হাদীস পড়েন তাহলে দেখবেন আবু দাউদের ৪৫৭৯ এবং ৪৫৮০ নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- *নবী করিম (সাঃ) বলেছেন "ইহুদীরা ৭১ বা ৭২টা দলে বিভক্ত, খ্রিস্টানরা ৬৯ বা ৭০টা দলে বিভক্ত। আর মুসলিমরা ৭৩টা দলে বিভক্ত হবে। "*

এরপর সহীহ তিরমিযীতে এ ব্যাপারে হাদীস রয়েছে। তিরমিযীর ১৩১ ও ২৬৪৩ নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- *আমাদের নবীজী মুহাম্মদ(সাঃ) বলেছেন, "বনী ইসরাইল (ইহুদী বা খ্রিস্টানরা) ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছে। তবে আমার উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে। একটা দল ব্যতীত অন্য সবাই দোযখে যাবে। সাহাবীগণ*

প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই দলে কারা? নবীজী বললেন, যারা আমাকে এবং আমার সহচরদের অনুসরণ করবে। ”

নবীজী (সাঃ) বলেছেন- ৭৩টি দল হবে আর ১টা দল বাদে সবাই দোযখে যাবে। এবং নাজাতপ্রাপ্ত দলে তারাই থাকবে, যারা নবীজী এবং তার সাহাবীগণকে অনুসরণ করবে।

আর একটা হাদীস আছে সহীহ বুখারীতে। সহীহ বুখারীর ৩ নং খণ্ডের ২৬৫২ নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- *রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “সবচেয়ে সেরা মানুষ হলো যারা আমার সময়টাতে ছিলো। অর্থাৎ সাহাবীগণ। এরপরে পরবর্তী প্রজন্ম আর তার পরে তার পরের প্রজন্ম। ”*

অর্থাৎ নবীজী বলেছেন, সবচেয়ে সেরা মানুষ সাহাবীগণ তারপর তাবেয়ীগণ এরপর তাবে-তাবেয়ীগণ। এরপরের কথা আর বলেননি।

তাহলে আমরা যদি কিছু গ্রহণ করি সেটা গ্রহণ করবো নবীজীর প্রজন্ম থেকে অর্থাৎ সাহাবীগণ, এরপর তাবেয়ীগণ এরপর তাবে-তাবেয়ীগণ থেকে। এই তিন প্রজন্মকে থেকে গ্রহণ করবো। তাঁদেরকে বলা হয় সালফে-সালেহীন; অর্থাৎ, ন্যায়নিষ্ঠ পূর্বপুরুষ অথবা ন্যায়নিষ্ঠ পূর্ববর্তীগণ। সালাফ অর্থ পূর্বপুরুষ বা পূর্ববর্তী।

তাহলে ইসলামী শরিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটাগরি মোট চারটা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ‘কুরআন’ আল্লাহ তায়ালার কালাম। যদি কোনো কিছু পবিত্র কুরআনে খুঁজে না পান তাহলে পরের উৎসে চলে যাবেন। আর পবিত্র কুরআনের পরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে ‘সহীহ হাদীস’। হাদীসগুলোর মধ্যে নবীজী (সাঃ) যে নির্দেশগুলো দিয়েছেন সেগুলোর গুরুত্ব তিনি যা করেছেন সেগুলোর চেয়ে বেশি। যদি নবীজীর কথা আর কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে সেখানে কথার গুরুত্ব বেশি। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে- সাহাবীগণ। তিনটি প্রজন্ম তথা সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণের ইজমা। সাহাবীগণের মধ্যে একজনের কথার চেয়ে কয়েকজনের কথা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারপর তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন। আর চতুর্থ উৎস বা শেষ উৎস হচ্ছে- ‘কিয়াস’। যদি উপরোক্ত ৩টি উৎসে কোনো সমাধান না পান; অর্থাৎ কুরআনে পেলেন না, হাদীসে পেলেন না, তিনটা প্রজন্মের জীবন কাহিনীতেও সেটা পেলেন না; তখন ব্যবহার করবেন ‘কিয়াস’। কিয়াস হচ্ছে- সাদৃশ্য দেখে অনুমান করা।

ইসলামী শরিয়তের ভিত্তি

তাহলে শরীয়তে চারটা জিনিস আছে। ১. পবিত্র কুরআন। ২. সহীহ হাদীস; কোনো সহীহ হাদীস কুরআনের বিরুদ্ধে যাবে না। এই হাদীসগুলোর মধ্যে কাজের চেয়ে কথার গুরুত্ব বেশি। নবীজীর নির্দেশের গুরুত্ব তার কাজের চেয়ে বেশি। ৩. তিন প্রজন্মের রেখে যাওয়া দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণ। এখানে একজনের চেয়ে কয়েকজনের গুরুত্ব বেশি। অর্থাৎ ইজমা তারপর হচ্ছে- ৪. কিয়াস।

আমরা এই নিয়মটা মেনে চলবো; কুরআন আর সুন্নাহ। কিন্তু সব দলইতো বলে যে, আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ মেনে চলি; কেউতো বলে না যে আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ মানি না।

এখন আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ মেনে চলবো কীভাবে? যেভাবে তিন প্রজন্ম মেনেছিলেন। কারণ নবীজী (সাঃ) বলেছেন, সেরা প্রজন্ম হলো আমার প্রজন্ম, তারপরের প্রজন্ম এবং তারপরের প্রজন্ম। তাই যদি কোনো মতভেদ দেখা দেয় যে, সাহাবীগণ সেটা কীভাবে বুঝেছিলেন। যদি সেখানে না পান তাহলে দেখবেন তার পরের প্রজন্ম তাবেয়ীনগণের মধ্যে। সেখানেও যদি না পান তাহলে দেখবেন তার পরের প্রজন্ম তাবে-তাবেয়ীনগণের মধ্যে। এভাবে মেনে চলবো।

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়তেরই একাধিক অর্থ হতে পারে। যেমন- ‘মাছেহ’। এর দুটো অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হতে পারে শারীরিক স্পর্শ এবং আর একটি অর্থ হতে পারে সহবাস। কিন্তু সহীহ হাদীস দেখলে দেখা যায় যে, এটার অর্থ হবে ‘সহবাস করা’ শারীরিক স্পর্শ নয়।

একইভাবে পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে যদি কোনো মতভেদ থাকে তাহলে সেটার আমরা ব্যাখ্যা খুঁজবো যে, কুরআনের অন্য কোনো আয়াতে বিষয়টি কীভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি সেখানে কোন ইশারা বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহলে সে আলোকে ব্যাখ্যা করব। যদি না থাকে তাহলে আমরা সহীহ হাদীসগুলো খুঁজে দেখবো যে, সেখানে বিষয়টি কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি সেখানেও না

পাওয়া যায় তাহলে দৃষ্টান্ত দেখতে হবে প্রথমে সাহাবীগণের তারপর তাবেয়ীনগণের এরপর তাবে-তাবেয়ীনগণের কার্যাবলীতে।

তাহলে কুরআন বুঝার জন্য আমাদের প্রথমে দেখতে হবে কুরআন তারপর সহীহ হাদীস এরপর সালফে-সালেহীনদের কাজ। আমরা এভাবেই মেনে চলবো।

এছাড়া পবিত্র কুরআনের আরো অনেক আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে। যেমন- পবিত্র কুরআনের ***(সূরা-বাক্বারা, অধ্যায়-২, আয়াত-১৫৪)***-তে আছে –

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ

অর্থ: "আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত্যু বলো না; বরং তারা জীবিত।"

এখানে অনেকে বলতে পারেন, তাহলে তারা তো বেঁচে আছেন। তাদের সাথে কথা বলতে পারবো। এখন যদি এই শহীদগণ জীবিত হন তাহলে তো আমাদের নবীজীও বেঁচে আছেন। খুব সুন্দর যুক্তি। কিন্তু সাহাবীগণ এটাকে কীভাবে বুঝেছিলেন? তারা কি ধরে নিয়েছিলে যে, নবীজী বেঁচে আছেন? তারা তো নবীজী (সাঃ)-এর জানাযার নামায পড়েছেন, তাকে কবরস্থ করেছেন। এছাড়া সাহাবীগণ যুদ্ধের ময়দানে সাথীদেরকে কবর দিয়েছেন, তাদের জানাযা পড়েছেন। জীবিত কারো জানাযা নামায কি পড়া যায়? উত্তর হবে- না, জীবিত কারো জানাযা নামাম পড়া যায় না।

এখানে কুরআনের আয়াত বলছে- শত্রুরা যখন উল্লাস করে বলে, 'তোমাদের লোকদের মেরেছি; তবে তাদের সাথে পরকালে দেখা হবে। আর তারাই হবেন লাভবান।

এখানে শারীরিকভাবে বেঁচে থাকার কথা বলা হচ্ছে না। যদি শারীরিকভাবে জীবিত থাকবেন তাহলে সাহাবীগণ তাদের কবর দেবেন কেন?

তাহলে কুরআনের কোনো আয়াতের কোনো অর্থ নিয়ে যদি মতভেদ দেখা দেয় তাহলে তার সমাধান খুঁজতে হবে-কুরআনে ও সহীহ হাদীসে অথবা দৃষ্টান্ত দেখতে হবে প্রথমে সাহাবীগণের তারপর তাবেয়ীনগণের এরপর তাবে-তাবেয়ীনগণের কর্মকান্ডে। ব্যাপারটা খুবই সহজ, কোনো কঠিন কাজ নয়। শুধুমাত্র একটু রিসার্চ করতে হবে।

এখন আরেক দল লোকের কথা বলবো। এমন কিছু লোক আছে- যাদেরকে যদি প্রশ্ন করি আপনি কোন দলের? আপনার পরিচয় কী? তারা বলে আমরা 'আহলে হাদীস'।আমি বলি, আহলে হাদীসের অর্থটা কী? তারা বলে আমরা হাদীসের অনুসারী; কুরআন এবং হাদীসের অনুসারী। আমি বলি, ভালো; কথায় যুক্তি আছে। আমি তাদের বলি, আপনি আপনাকে আহলে হাদীস বলছেন, আর আমি আমাকে বলি আহলে সহীহ হাদীস। কারণ, আমি মানি শুধু কুরআন আর সহীহ হাদীস। অনেক মুসলিম আছে যারা মানে যয়ীফ আর মাওযু হাদীস। এজন্য যদি কেউ এমন নামে ডাকতে চায় তাহলে আমি আমাকে আহলে সহীহ হাদীস নামে অভিহিত করবো।

দেখুন, অনেক হাদীস আছে যেগুলো যয়ীফ হাদীস আর মাওযু হাদীস। যেমন, নাভীর নীচে হাত বাধাসহ এরকম আরো কিছু মাসায়েল সম্পর্কীত হাদীস। আমি শুধু সহীহ হাদীসগুলোই মেনে চলি। এই লোকগুলোকে আমি আরো বলি- ভাই, আপনার আহলে হাদীস মানে কুরআন আর হাদীস পুরোপুরিভাবে মেনে চলেন। খুব ভালো কথা। আমার প্রশ্ন হলো পবিত্র কুরআনের কোন সূরায় কোন আয়াতে বলা হয়েছে যে, নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে ডাকো? তারা এ কথার কোনো উত্তর দেয় না। আবার বলি, এমন কোন সহীহ হাদীসে আছে, যেখানে নবীজী বলেছেন নিজেদের আহলে হাদীস বলে ডাকো? উত্তর নেই।

এসব কারণে আমি নিজেকে আহলে হাদীস বলে ডাকি না; বরং আমি মুসলিম আর পাক্কা আহলে হাদীস। আপনারা হলেন আংশিক আহলে হাদীস তথা ৯০% বা ৯৫% আহলে হাদীস; আর আমি পুরোপুরি আহলে হাদীস, আহলে সহীহ হাদীস। আপনারা যদি কুরআন এবং হাদীস মেনে চলেন তাহলে একথাতো ঠিক যে, কুরআনের কোনো আয়াত বলছে না যে, নিজেকে আহলে হাদীস বলে ডাকো; অথবা কোনো সহীহ হাদীসেও নেই যেখানে কবীজী (সা:) বলেছেন- তোমরা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে ডাকো।

এছাড়াও আরো একটা গ্রুপ আছে আহলে হাদীসের মতো। যারা বলে আমরা সালাফী। আমি বলি 'সালাফী' মানে কী? তারা বলে, আমরা মানি 'সালফে-সালেহীনকে'। আমি বলি, আমিওতো 'সালফে-সালেহীনকে' মানি। আমি মানি, কুরআন, হাদীস ও সালফে-সালেহীনকে। নবীজীর প্রজন্ম এবং তার পরবর্তী দুটো প্রন্মকে। তারপর তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, কুরআনের কোনো আয়াতে কী একথা বলা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদেরকে সালাফী বলে উল্লেখ করো? তারা বলে, না।

আবার বলি, কোনো সহীহ হাদীসে কি উল্লেখ আছে যেখানে নবীজী (সাঃ) বলেছেন- তোমরা নিজেদেরকে সালাফী বলে উল্লেখ করো? তারা বলে, না, নেই।

তবে, কিছুদিন আগে একজন সালাফী আমাকে একটি হাদীস দেখালো যেখানে নবীজী বলেছেন, 'আমি একজন সালাফ'। সে এটি সহীহ মুসলিমের উদ্বৃতি দিয়ে বললো; কিন্তু পুরো রেঁফারেন্সটি সে বলেনি। আমি বললাম, ঠিক আছে। এরপর আমি সহীহ মুসলিম খুলে দেখলাম যে, হাদীসটি আছে সহীহ মুসলিমের ২ হাজার ৪০৬ নম্বরে। হাদীসটি সহীহ হাদীস নি:সন্দেহে; এই শব্দটি মাঝখান থেকে নেওয়া। পুরো হাদীসটি বলছে-

"মুহাম্মদ (সাঃ) (তাঁর কন্যা) ফাতিমা (রাঃ)-কে বললেন, আমি একজন উৎকৃষ্ট সালাফ তোমার জন্য।"

আমি তোমার জন্য একজন উৎকৃষ্ট সালাফ কথাটি বাবা বলছেন তার মেয়েকে। অর্থাৎ ফাতিমা (রাঃ)- কে বলেছেন তাঁর বাবা নবীজী (সাঃ) যে, তোমার জন্য আমি একজন উৎকৃষ্ট সালাফ। আরবি ভাষায় সালাফ মানে 'পূর্বপুরুষ বা পূর্বসূরী'।

তাহলে আমি যদি আমার মেয়েকে বলি যে, আমি তোমার 'সালাফ' তাহলে কোনো সমস্যা নেই; কারণও নেই। একজন আরব খ্রিস্টান যদি বলে আমি তোমার 'সালাফ' তাহলে কোনো সমস্যা নেই। অর্থগত দিক থেকে এরকম ভাবা বা মনে করার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই; কারণও নেই।

তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সালাফ শব্দটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে। আমাদের নবীজী (সাঃ) অবশ্যই তার কন্যার জন্য উৎকৃষ্ট সালাফ ছিলেন; কিন্তু আমরা সকল বাবা-ই তার কন্যার জন্য ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উৎকৃষ্টমানের সালাফ নেই। এমন হতে পারে যে, হয়তো সেই সন্তান তার বাবার চেয়ে আরো বেশি ইসলামিক।

তাহলে প্রত্যেক বাবা-মা-ই তার সন্তানকে এ কথাটি বলতে পারে না যে, সে সন্তানের জন্য উৎকৃষ্টমানের সালাফ। সালাফের যদি শব্দগত অর্থ নেন, তাহলে বিশেষজ্ঞদের মতে (সালাফীদের মধ্যে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ আছেন) "বর্তমানে কেউ বলতে পারে না যে, সে একজন সালাফ।" কেন? কারণ আমরা খারাপ, আমরা পরে এসেছি। সালাফীগণ ছিলেন আমাদের আগে। তাহলে আগের মানুষদের সাথে

তুলনা করলে আমরা খারাপ। তবে হ্যাঁ, আমরা আমাদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি, বংশধরদের জন্য সালাফ হতে পারি, আর সেটা শব্দগতভাবে; ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সালাফী নই বরং আমরা খারাপ।

আমি একবার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলাম লেকচার ট্যুরে আর সেবারই ছিলো সেখানে প্রথম যাওয়া। সেখানে যারা ডেকেছিলেন তারাও ছিলেন কুরআন সুন্নাহর অনুসারী। আমি যথা সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছলাম এবং যে শহরে যাওয়ার কথা সেখানে গেলাম। রাতের বেলা আমি আমার সাথে যাওয়া অন্যান্যদের নিয়ে পৌঁছলাম এবং সবাই মিলে সেখানে নামায আদায় করলাম। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে একজন খুব জোরে শব্দ করে বললেন, “আরে আপনারাতো আমাদের মতো করেই নামায পড়েন।” আমি বললাম, আপনাদের মতো করে মানে? আমি তো নবীজীর মতো করে নামায পড়ি। আমরা আপনাদের মতো করে নামায পড়তে যাবো কেন? আমরা নামায পড়ি নবীজী (সাঃ)-এর মতো। এ গ্রুপের লোকজনও মাশাআল্লাহ্। কুরআন ও সহীহ হাদীস মেনে চলেন। হবে তাদের বলা উচিত ছিলো- মাশাআল্লাহ্, আপনারা নবীজী (সাঃ)- এর মতো করে নামায পড়েন;

আমাদের মতো করে নয়। কারণ আমি তো তাদের দেখে নামায পড়ছি না বরং আমি আগে থেকেই নামায পড়ছি। আর আমি তাদের মতো করে নামার পড়ছি না; নবীজী (সাঃ)-এর মতো করে নামায পড়ছি। আর মাশাআল্লাহ, তারাও নবীজী (সাঃ)-এর মতো করে নামায পড়ছে। তার বলা উচিত ছিলো- মাশাআল্লাহ, আপনারা নবীজী (সাঃ)-এর মতো করে নামায পড়েছেন আর আমরাও নবীজী (সাঃ)-এর মতো করে নামায পড়ি। সে তা না বলে বললো, আরে আপনারাতো আমাদের মতো করে নামায পড়েন। খুব খুশি।

তারা আগে আমার ভিডিও ক্যাসেটগুলো দেখেছিলো এবং এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, “ডা. জাকির ধর্ম সম্পর্কিত যে কথাগুলো বলেছিলো সেগুলো সঠিক।” কিন্তু তারা আমার আক্বিদা সম্পর্কে জানতো না যে, আমার ধর্ম বিশ্বাস কেমন। আর সে কারণেই তারা খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি। তারা দেখেছে যে, আমি বিভিন্ন ধর্মের উপর একজন স্পেশালিস্ট; কিন্তু তারা আমার ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে জানে না। তারপরও তারা আমাকে আমন্ত্রণ করলো আর নামায দেখে তার খুব খুশি হলো যে, হ্যাঁ, আপনারাতো আমাদের মতো করেই নামায পড়েন। তবে তারা সকলেই খুব ভালো, মাশাআল্লাহ। তারপর আমি সেখানে কিছু বক্তব্য রাখলাম। অতপর যখন আমরা সকলে মিলে ডিনার খেতে বসলাম

তখন আমি তাদেরকে আজকের মতো করেই বললাম, আমি পাক্কা হানাফী, পাক্কা শাফেয়ী, পাক্কা মালিকী, পাক্কা হাম্বলী। এরমধ্যে সালাফী প্রসঙ্গ আসলে আমি বললাম, আমি পাক্কা সালাফী। হবে কুরআনে কোথায়ও নেই যে, তোমরা নিজেদেরকে সালাফী বলে ডাকো অথবা কোনো সহীহ হাদীসেও নেই যেখানে নবীজী (সাঃ) বলেছেন- তোমরা তোমাদেরকে সালাফী নামে আখ্যা দাও।

সেখানকার সকলেই আমার সাথে একমত পোষণ করলেন, শুধুমাত্র একজন ব্যতীত। অন্য সকলেই বললেন, জাকির ভাই, আপনি যা বলেছেন তার সাথে আমরা একমত। একজন মাত্র আমাকে প্রশ্ন করলো- ভাই জাকির, শেখ নাসির উদ্দিন আলবানির নাম শুনেছেন? আমি বললাম- হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি। তিনি বললেন- তাকে কেমন মনে হয়? আমি বললাম- মাশাআল্লাহ, আমি তাকে ভালো করে জানি এবং তিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের একজন। (মাত্র কয়েক বছর আগের কথা, যখন শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি জীবিত ছিলেন।) তিনি আমাকে বললেন- আচ্ছা, তার কথা মানেন? আমি বললাম- হ্যাঁ, তিনি বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি, ভালোবাসি। তিনি বললেন, আমি আলবানির কথা থেকে উদ্বৃতি দিচ্ছি। একথা বলে তিনি albani.com -এ গিয়ে তার ফতওয়া Download করে বললেন, এই ফতওয়ার উত্তর দিন।

আলহামদুলিল্লাহ, শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি (র) (আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন) একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি, ভালোবাসি। মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ ব্যাপারে দুটো গ্রুপ আছে। এক গ্রুপ বলেন- 'সালাফী বলে পরিচয় দেওয়া ফরয'। শেখ আলবানি (র) হচ্ছেন- এই দলে তথা সালাফী বলে পরিচয় দেওয়া ফরয বলে বিশ্বাসীদের দলে। আমি তার ফতওয়ার উদ্বৃতি দেখে বললাম- আলহামদুলিল্লাহ, কেউ যদি কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি আজকে প্রমাণ পেলে সেটা আজ থেকেই পালন করা শুরু করবো। তবে আমি সেটা যাচাই-বাছাই করে দেখবো।

আমি আমার ধর্মের লেবেল হিসেবে নিজেকে বলতে চাই 'একজন মুসলিম'।

যখন আমি শেখ নাসির উদ্দিন আলবানির ফতওয়াটা পড়লাম (তিনি তার সময়ের একজন সেরা বিশেষজ্ঞ) সেখানে দেখলাম, তিনি লিখেছেন- "ইমাম আবু হানিফা (র) বলেছেন- হাদীসে আছে- ইসলামে ৭৩টি দল হবে এবং তার মধ্যে একটা দল মাত্র

নাজাত পাবে। আর সেই দলটা হচ্ছে- ‘জামাহ’। এই জামাহ অর্থ হচ্ছে- সালাফে-সালেহীন তথা প্রথম তিন প্রজন্ম।” হাদীসটা আছে- সহীহ বুখারীতে

হ্যাঁ, আমি সেটা মানি। আমিও প্রথম তিন প্রজন্মকে অনুসরণ করি।

তিনি ইমাম আবু হানিফার উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন- জামাহ অর্থ অনুসরণ করা; সাহাবীগণ এবং তৎপরবর্তী দুই প্রজন্মকে যারা সালাফে-সালেহীন।

আমিও প্রথম তিন প্রজন্মকে অনুসরণ করি।

সে আমাকে আরো দেখালো ইবনে তাইমিয়ার উদ্বৃতি যে, “তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক সালাফে-সালেহীনকে অনুসরণ করা।” আমি বললাম- হ্যাঁ আমি তো এটি মানি।

তারপর সে আমাকে আরো উদ্বৃতি দেখালো ইমাম শাফেয়ীর। সেটা হচ্ছে- “এটা বাধ্যতামূলক, তোমরা মেনে চলবে তিন প্রজন্মকে; ধার্মিক পুরুষদের।” আমি বললাম- হ্যাঁ আমি এটাও মানি; সমস্যাটা কোথায়? তারা কি কোথায়ও বলেছেন তোমরা নিজেদেরকে সালাফী বলে ডাকো? আবু হানিফা একথা বলেননি, ইমাম শাফেয়ীও কখনও বলেননি, শেখ ইবনে তাইমিয়াও বলেননি। লোকে মনে করে তারা এটি বলেছেন; আসলে বলেননি।

তাহলে কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণ করা যাচ্ছে না যে, নিজেদেরকে বলতে হবে ‘সালাফী’। এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হলো একটা কিয়াস; শেখ নাসির উদ্দিন আলবানির দেওয়া যুক্তি।

শেখ নাসির উদ্দিন আলবানিকে একজন তার্কিক প্রশ্ন করেছিলো, (ইন্টারনেটে albani.com-এ গেলে দেখতে পাবেন) তিনি সেখানে যুক্তি দিয়েছেন- কেনো আমারা নিজেদেরকে সালাফে-সালেহীন বলবো। একজন প্রশ্নকারীর সাথে সেখানে তার আলোচনা রয়েছে। প্রশ্নকারী এক জায়গায় বলেছেন, আমি একজন মুসলিম। শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি প্রশ্ন করেছেন- আপনি কোন ধরনের মুসলিম? আপনি কি খারেজী? আপনি কি মুতাযেলী? আপনি কি শিয়া? আপনি কি রাফেযী? নাকি একজন কাদরী? কোন ধরনের মুসলিম? প্রশ্নকারী বললো- “আমি কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলা একজন মুসলিম। ” শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি প্রশ্ন করলেন- কোন সুন্নাহ? কুরআন-সুন্নাহ তো খারেজীরা মেনে চলে, রাফেযীরা মেনে চলে, শিয়ারাও কুরআন সুন্নাহ মেনে

চলে, আবার কাদরীরাও কুরআন-সুন্নাহ মানে। আপনি কোন ধরনের কুরআন-সুন্নাহর কথা বলছেন? প্রশ্নকারী বললো- আমি সেই কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলি যেভাবে সালাফে-সালেহীন ব্যাখ্যা করেছেন। শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি তখন বললে- হ্যাঁ, আমরা কুরআন-সুন্নাহ মানবো যেভাবে সালাফে-সালেহীন ব্যাখ্যা করেছেন। তাহলে এই বড় বাক্যটাকেই ছোট করে বললে হয় 'সালাফী ' । এটা বলে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি তর্কে জিতলেন।

শেখ নাসির উদ্দিন আলবানিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করি, তাকে ভালোবাসি। আমার অনেক বক্তব্যে তার রেফারেন্স দিয়েছি। তাকে আমি সম্মান করি। তবে তাকলীদ নয়। তাকলীদ শুধুমাত্র আল্লাহ্ এবং রাসূলের জন্য। হ্যাঁ, এটা একটা যুক্তি, এটা একটা কিয়াস।

আমি এখন বলবো, কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে প্রমাণ করে দেখান; কোনো যুক্তি নয়। আমি চাই সরাসরি রেফারেন্স কুরআন এবং হাদীসের। কোনো যুক্তি চাচ্ছি না। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যথেষ্ট যুক্তিবুদ্ধি আমাকে দিয়েছেন। আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নই; আমি নিজেকে মনে করি একজন ছাত্র, তালবে ইলম। তবে আল্লাহর রহমতে অনেক বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলেছি। আলহামদুলিল্লাহ, ইন্ডিয়ার বড় বড় বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করেছি; তাদের কেউ এসেছেন নদওয়া থেকে, কেউ এসেছেন দেওবন্দ থেকে। সৌদির বিশেষজ্ঞের সাথে, মিশরের বিশেষজ্ঞের সাথে, ইরানের বিশেষজ্ঞের সাথে এবং অন্যান্য অনেক দেশের বিশেষজ্ঞের সাথে আমি আলোচনা করেছি। আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন তাই আমাদের এই সময়ের বিখ্যাত অনেক বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ; তাদের সংস্পর্শে আসার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারপরও আমি একজন ছাত্র মাত্র। খুবই ক্ষুদ্র একজন মানুষ, আমার জ্ঞান খুব সামান্য; তবে যুক্তি পাল্টা যুক্তির ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে অনেক রহমত করেছেন।

এখন আপনি কোন ধরনের মুসলিম? আপনি কি খারেজী? মুতাযেলী? শিয়া? রাফেযী? নাকি কাদরী? কোন ধরনের মুসলিম? তর্কটা ছিলো এটি নিয়ে, সেই প্রশ্নকারী আর শেখ নাসির উদ্দিন আলবানির মধ্যে। প্রশ্নকারী বললো- আল্লাহ তার কুরআনে বলেছেন নিজেদের মুসলিম বলে ডাকো। শেখ তখন উত্তর দিয়েছিলেন-ইসলাম ছিলো তখন মাত্র একদল, আর এখন অনেক আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত। আর একারণেই

মুসলিমদের জন্য ফরয যে, আমরা নিজেদেরকে পরিচয় দিতে গিয়ে বলবো সালাফী। এটা একটা যুক্তি। তর্ক সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো আর শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি তর্কে জিতেছিলেন।

এখন আমি উত্তর দিচ্ছি- আমার সাথে তর্ক করার প্রয়োজন নেই। আপনি কুরআন হাদীস থেকে দেখান তাহলে ডা. জাকির নায়েক সাথে সাথে মেনে নেবে। বিতর্কের ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে রহমত করেছেন, আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। আমি এখন তার উত্তর দিচ্ছি,(আমি তার কাছে অর্থাৎ শেখ নাসির উদ্দিন আলবানির কাছে একেবারেই তুচ্ছ, সমুদ্রের মধ্যে একফোটা পানির মতো। প্লিজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি তাকে সম্মান করি এবং আমি আগে অনেক লেকচারে তার রেফারেন্স দিয়েছি।) আমি বলবো, আচ্ছা। আপনারা যদি আমাদের নবীজী (সাঃ)-এর জীবন কাহিনী দেখেন তাহলে দেখবেন, তিনি কোনো হাদীসেও বলেননি আর কোনো আয়াতও দেখাননি যেখানে আমাদের বলতে বলা হয়েছে যে, নিজেদেরকে সালাফী বলতে হবে। আর সে কারণেই আমি বলবো না।

এখন যুক্তি! আমাদের নবীজী (সাঃ)-এর সময়েও অনেক ভণ্ডলোক ছিলো, যারা ছিলো মুনাফিক। তারা মুনাফিক ছিলো; সাহাবীগণ তাদের নামটা বদলাননি। এরপরে ছিলো খারেজী। তারা নিজেদেরকে বলতো খারিজী; লোকজনও তাদেরকে খারেজী আখ্যায় আখ্যায়িত করতো; কিন্তু সাহাবীগণ তাদেরকে বলতেন মুসলিম। এখানে সাহাবীগণ কি বলেছেন যে, তাদের নতুন নাম দাও? না, সাহাবীগণ তারপরও তাদের বলেছেন 'মুসলিম'। তারপরে আছে মুতাযিলা। তাদেরকেও সবাই বলতো 'মুসলিম'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে- সেই সময়েও ধর্ম নিয়ে মতভেদ ছিলো; এমন নয় যে, ধর্ম নিয়ে মতভেদ ছিলো না।

এবার মূল আলোচনা প্রসঙ্গে আসি। শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি বলেছেন, আমাদের পরিচয় দিতে গিয়ে নিজেদেরকে সালাফী বলা উচিত। এখানে আমার প্রশ্ন হলো- কোন সালাফী? আমি প্রশ্ন করবো- সালাফীদের মধ্যেও এখন গ্রুপ আছে। আমি বলবো- আপনি কুতুবী, ছুরুরী নাকি মাদখালী? আরো কয়েকটি গ্রুপের কথা বলতে পারি। (দেখুন আমি এখানে কারো বিরুদ্ধে বলছি না; প্লিজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি কাউকে ছোট করতে চাচ্ছি না। তবে এখন সালাফীদের মধ্যে অনেক গ্রুপ আছে। আপনি যদি ইংল্যান্ডে যান দেখবেন, অনেকগুলো গ্রুপ আছে; আর সেখানে প্রত্যেকটা

গ্রুপ অন্য গ্রুপের সাথে লড়াই করছে আর বলছে অন্য সালাফী গ্রুপগুলো কাফির। নাউযুবিল্লাহ! সময় পেলে এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করবো) আপনি কোন সালাফীদের গ্রুপে যাবেন? আপনি যে লেবেলটায় বসাবেন সেখানে একটা পর্যায়ে বিভক্তি চলে আসতেই হবে।

যখন শিয়ারা আসলো তখন লোকজন বললো আমরা সুন্নি তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত। তারপর সেখানেও বিভক্তি এসে হলো হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী। তারপর আসলো সালাফী ও আহলে হাদীস। এগুলোর মধ্যেও গ্রুপ আছে। যখনই আমরা মানুষরা একটা লেবেল বসাবো সেখানে একটা মতভেদ হবেই। এমনকি আমাদের ধর্ম নিয়েও অনেক মতভেদ হবে আর সেটা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন। শুধুমাত্র মানুষের দেয়া লেবেলেই মতভেদ হয় না।

আপনি কি মনে করছেন এগুলো আল্লাহ জানতেন না? আল্লাহ অবশ্যই জানতেন যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতভেদ হবে আর একথা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন। নবীজীও হাদীসে বলেছেন একথা। তবে নবীজী বলেননি যে, নিজেদের পরিচয় দাও 'সালাফী বা আহলে হাদীস ' বলে।

যদি বলি আহলে হাদিস, তবে প্রশ্ন আসে কোন আহলে হাদিস ? আমি যেখানে থাকি সেই বোম্বেতে দুটো আহলে হাদিস আছে। ১.জামিয়াত আহলে হাদিস ও ২. কুরবাত আহলে হাদিস । এখন আপনি কোন দলে যেতে চান ? (এক আহলে হাদিস আরেক আহলে হাদিসকে দোষারোপ করে । দেখুন এখানে আমি আহলে হাদিসের নামে বদনাম করছি না। এজন্য বলছি ট্রপিক্সটা খুব স্পর্শকাতর। আমি শেখ নাসির উদ্দিন আলবানিকে শ্রদ্ধা করি, আহলে হাদিসদের শ্রদ্ধা করি । আর অন্যান্যরাও আমার সাথে একমত হবেন যে, সালফী আর আহলে হাদিসরা কুরআন হাদিসের সবচেয়ে কাছাকাছি; এটা আমি স্বীকার করবো) আর যদি বলি 'সালাফী' তাহলে প্রশ্ন আসে কোন সালাফী? প্রথমদিকে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানির সময়েও হয়তো সালাফীদের মধ্যে গ্রুপ ছিলো আর এখন অনেক গ্রুপ আছে । সালাফীদের মধ্যে রয়েছে – কুতুবী, মাদখালী; এখন আবার বের হয়েছে ট্রু সালাফী । আমি সালাফীদের একটি দাওয়া অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম । এই ট্রু সালাফীটা আসলে কী ? আমরা বোম্বেতে দাওয়ার উপর প্রশিক্ষন দেই; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। সেবার ১৪টি দেশ থেকে ১৯ জন প্রশিক্ষণ নিতে এসেছিলেন । তাদের অনেকেই এসেছিলেন মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর

তাদের অনেকেই মাশাআল্লাহ, সালাফী। আমরা তাদের সাথে আলোচনা করলাম সেখানে। সালাফী হলো সংক্ষিপ্ত রুপ। অর্থাৎ কুরআন হাদিস সালাফে-সালেহীন যেভাবে মানতেন সেভাবে মানা। এর সংক্ষিপ্ত হচ্ছে 'সালাফী'। সেটাই আমি তাদেরকে প্রশ্ন করলাম –আচ্ছা বলুনতো, সালাফে-সালেহীন আগে নাকি মুহাম্মদ (সাঃ) আগে ? কে আগে ? তারা বললো –মুহাম্মদ (সাঃ) আগে । আমি তাদেরকে বললাম – তাহলে নিজেদেরকে মুহাম্মাদী বলছেন না কেন ? (ইন্ডিয়াতে একদল লোক নিজেদেরকে মুহাম্মাদী বলে পরিচয় দেয়। যাদেরকে আমরা মানি না।) এখন আবার প্রশ্ন হলো- কে বড়? মুহাম্মদ (সাঃ) নাকি আল্লাহ ? উত্তর হচ্ছে – আল্লাহ । আর যে আল্লাহর আনুগত্য করে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাকে বলা হয় 'মুসলিম ' ।

আমরা জানি , মুসলিমদের মধ্যেও অনেক দল আছে। আর নতুন কোন নাম দিলে সেটার মধ্যে বিভক্তি এসে যাবে। হানাফী মাযহাবে চারটা গ্রুপ আছে , শাফেয়ী মাযহাবে আছে কাদিম (পুরাতন) আর জাদিদ (নতুন) ।আবার কাশ্মির গেলে দেখবেন সেখানে আহলে হাদিসের অনেক গ্রুপ আছে আর কেরালায় গেলে দেখবেন মুজাহিদী। কেরালায় কেউ নিজেদেরকে আহলে হাদিস বলে না, তারা বলে যে তারা মুজাহিদী; এবং তারা আহলে হাদিস সম্পর্কে জানেই না। আবার সৌদি আরব গেলে সেখানে দেখবেন, তারা আহলে হাদিস শব্দের সাথে পরিচিত নন। তারা সালাফী শব্দের সাথে পরিচিত। তবে সালাফী আর আহলে হাদিস দুটো একই রকম নামটা আলাদা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে – এক এক জায়গায় এক এক নাম। ইন্ডিয়ার আহলে হাদিসগণ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সালাফী নামে পরিচিত। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি যে, যদি আপনি লেবেল দিতে যান তাহলে সেখানে বিভক্তি আসবেই। সালাফীর চেয়ে মুহাম্মাদী বলা ভালো; আবার মুহাম্মাদীর চেয়ে মুসলিম বলা ভালো। সেজন্য আমি বলতে চাই যে নবী এবং রাসুলগণকে মানবো আর নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিবো; আর কিছু নয়। শুরুতেও মুসলিম, আর শেষেও মুসলিম। আমি কোন মুসলিম ভাইকে ছোট করছি না। হোক সে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, আহলে হাদিস বা সালাফী। শেখ উতাইবিকে একজন প্রশ্ন করলো (যিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব)- আমাদের দেশে অনেকে নিজেদের বলে ইখওয়ানী আর তাবলিগী। এরা কি সত্যের পথে আছে নাকি ভুল পথে আছে? শেখ উতাইবি উত্তর দিলেন– 'কেউ যদি ইসলাম প্রচারের সময় বলে যে, সে ইখওয়ানী, তাবলীগী বা সালাফী; তাহলে সে ভুল পথে আছে । প্রশ্নকারীর প্রশ্নের মধ্যে সালাফী শব্দটা ছিল না , কিন্তু শেখ উতাইবি সেখানে

সালাফী শব্দটা যোগ করলেন । যদি কেউ ইসলাম প্রচারের সময় নিজেকে ইখওয়ানী তাবলীগী বলে তাহলে সে ভুল পথে আছে। আর এই কথাটা কিন্তু আমি বলিনি। ডা. জাকির নায়েক ইসলামের কিছুই নয়, বরং শূন্য।

শেখ উতাইবি মাশাআল্লাহ, বিখ্যাত একজন ব্যক্তিত্ব; আর আমি তার ফতওয়াটা শুধু মেনে চলছি। যদি কোন সালাফী দোষারোপ করতে চান তাহলে শেখ উতাইবিকে দোষারোপ করতে হবে।

সালাফীদের ওয়েব সাইটে গিয়ে দেখবেন, তারা বলছে- শেখ উতাইবি নিজেকে সালাফী বলে পরিচয় দিতে বলেছেন। কিভাবে? তিনি সালাফে-সালেহীনদের মেনে চলতে বলেছেন। আমি বলবো, এ কথাতো আমিও বলি। শেখ উতাইবিকে প্রশ্ন করলেও তিনি এভাবে ভাবতে সমস্যা মনে করতেন না; শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের সময় একথা বলা যাবে না যে, আমি সালাফী বা তাবলীগী। যদি বলা হয় তাহলে সে ব্যাপারে শেখ উতাইবি বলেছেন যে , সেটা ভুল কাজ।

তাহলে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি বলেছেন সালাফী বলা ফরয আর শেখ উতাইবি বলেছেন এটা ভুল। তবে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি বলেছেন, যদি মনে করো সালাফী বলে তুমি সবার শ্রেষ্ঠ ,তাহলে সেটা ভুল। অর্থাৎ এখানে দুজনের কথা প্রায় একই। তাহলে যে বিশেষজ্ঞরা নিজেকে সালাফী বলে পরিচয় দিতে বলেছেন, তারাও মনে করতেন যে, যদি তুমি তোমাকে সালাফী বলে পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি ভাবো যে ,তুমি সালাফী বলে তুমি সবার শ্রেষ্ঠ আর তুমিই একমাত্র বেহেস্তে যাবে ; অন্যরা যেতে পারবে না ; তাহলে সেটা ভুল।

শেখ উতাইবি বলেছেন, সালাফী বলে পরিচয় দেয়াটা ভুল। আমি শেখ উতাইবির মতে কঠিন করে বলবো না; তবে যদি বলতে বলেন , তাহলে বলবো- মুসলিম বলে পরিচয় দেওয়াটাই ভালো। যদি কেউ নিজেকে সালাফী বলে পরিচয় দেয়, কোন ক্ষেত্রে সেটা মুবাহ। আমি বলছি না যে, এটা হারাম। তবে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে- মুসলিম বলা; আর এটা ১০০% সংরক্ষিত। এটা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের কোন মতভেদ হবে না।

যদি কেউ সংক্ষেপে বলতে চায় ঐ কথাটাকে যে, আমি মানবো কুরআন হাদিস আর সালফে-সালেহীনদেরকে আর এটা বুঝাতে গিয়ে সালাফী বলে পরিচয় দেয় তাহলে বলবো এটা মুবাহ তবে ফরয নয়। আমি এখানে যে ফতওয়াটা মানবো সেটা হলো শেখ সালেহ মুনাজ্জিদের ফতওয়া। তিনি বলেছেন, আপনি মনে করেন যে,

আপনি কুরআন হাদিস না মানা লোকদের দলে নন আর এটা বুঝতে গিয়ে উক্ত পরিচয় দেন তাহলে সমস্যা নেই।

কিন্তু যদি কেউ বলে, আমি সালাফী বলে শ্রেষ্ঠ তাহলে সেটা ভুল। তিনি এটা বুঝাতে গিয়ে নবীজী (সাঃ) এর একটা হাদিসের উদ্বৃতি দিয়েছেন– নবীজী (সাঃ) যখন মদীনায় ছিলেন সে সময় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একবার কোন্দল হোল। তখন আনসাররা অন্যান্য আনসারদেরকে ডাকলেন তাদের সাহায্য করার জন্য আর মুহাজিররাও তাদের সাহায্যের জন্য অনন্য মুহাজিরদের ডাকলেন। নবীজী(সাঃ) তখন বললেন, এই জাহেলিয়াত সম্বোধনটার কারণ কি ?

এমনি কিন্তু আনসার শব্দটা খারাপ না আবার মুহাজির শব্দটাও খারাপ নয়। কিন্তু এখানে গুরুত্ব দিয়ে ডাকা হচ্ছে – আনসার আমাকে সাহায্য, মুহাজির আমাকে সাহায্য করো। নবীজী (সাঃ) বলেছেন- এটা জাহিলিয়াত সম্বোধন। আনসার একটা সুন্দর নাম। আনসার হচ্ছেন আমাদের নবীজীর সাহায্যকারী। আর মুহাজির মানে যারা হিজরত করেছেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পথে। এগুলো সুন্দর নাম; কিন্তু রাসূল(সাঃ) বলেছেন, এটা হারাম, জাহেলিয়াত। এটা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানানোর প্রচেষ্টা। তবে এটার উপর ভিত্তি করে আমি বলছি না যে, সালাফী বলা হারাম। আমাকে ভুল বুঝবেন না। তবে সবচেয়ে ভালো হলো- মুসলিম বলে পরিচয় দেওয়া। এটা সেফ, এতে ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

এমনিতে আপনি হতে পারেন ,পাক্কা হানাফী, পাক্কা শাফেয়ী, পাক্কা হাম্বলী,পাক্কা মালেকী,পাক্কা আহলে হাদিস, পাক্কা সালাফী। কোন সমস্যা নেই। কিন্তু পরিচয় দিতে গিয়ে বলবেন– আমি মুসলিম, প্রচার করবেন মুসলিম বলে।

লেকচার শেষ করার আগে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের কিছু বক্তব্যের উদ্বৃতি দেবো, যাতে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারেন। অনেকে তাকলীদের কথা বলেন। তাকলীদ থাকলে তাকে কাফির বলা হচ্ছে। ইমাম শাফেয়ী (র) (আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন) বলেছেন, *আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ডাকবে আল্লাহ যে নামগুলো বলেছেন সেসব নামে; অন্য নামে ডাকা হারাম, কুফরি। আল্লাহকে ডাকবেন যে নামে তার রাসূল ডেকেছেন সে নামে, অন্য নামে নয়। অন্য নামে ডাকা হারাম। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহকে অন্য নামে ডাকে ব্যাপারটা না জেনে, তাহলে সে কাফির নয়।* ইমাম শাফেয়ী এটা বলেছেন।

শেখ ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন, *"যদি কেউ কোনো মানুষকে সিজদা করে আর মনে করে যে, এটাই তার দ্বীন; তাহলে সে অবিশ্বাসী নয় ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ না তাকে অন্য কোনো লোক তাকে ব্যাখ্যা করে বলে এবং সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"* একথা বলেছেন, শেখ ইবনে তাইমিয়া যিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

এছাড়াও আরো দেখবেন, শেখ শাওকানীর মতামত। তিনি বলেছেন, *"যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে নতজানু হয়, এবং ব্যাপারটা সে না জানে তাহলে সে অবিশ্বাসী নয়।"*

শেখ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহহাব (র) বলেছেন, *"আমরা তাদেরকে অবিশ্বাসী বা কাফির বলি না, যারা আব্দুল কাদিরের মূর্তি বানিয়ে বা তার কবরের সামনে নতজানু হয় অথবা আহমদ নাখতাওয়ীর মূর্তি বা তার কবরের সামনে নতজানু হয়।"*

তাহলে তাদেরকে কীভাবে আমরা অবিশ্বাসী বলি যারা শিরক বরে না? আমরা বলি, আমরা অনেক জানি; আমরা অন্যদেরকে বলি কাফির ইত্যাদি।

লেকচার শেষ করার আগে নবীজীর দুটো হাদীসের কথা বলবো। মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন- (সহীহ মুসলিম তিন নং খণ্ড, হাদীস নং ৪৫৬৫) *"একটা সময় আসবে যে সময় সমাজে অনেক খারাপ কাজ হবে। আর কখনো যদি কেউ মুসলিম উম্মাহর একতা নষ্ট করতে চায় তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করো। আর তাতেও যদি সে ক্ষান্ত না হয় তাহলে তাকে মেরে ফেলো।"*

লেকচার শেষ করার আগে নবীজীর আরো একটি হাদীসের কথা বলবো। সহীহ বুখারীর ৪ নং খণ্ড, হাদীস নং ৩৬০৬। এই হাদীসের বলেই আমি শেষ করবো। এখানে *হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা) বলেছেন, লোকজন নবীজী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করতো কোন জিনিসটা ভালো? তবে আমি ভয় পেয়ে নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোনটা খারাপ জিনিস? তিনি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, অজ্ঞানতরা কারণে আমরা অনেক খারাপ কাজ করেছি; আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন। এরপরে কি আর কোনো খারাপ কাজ হবে? নবীজী (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, খারাপ কাজ হবে। তিনি বললেন, সেই খারাপ কাজের পরে কি কোনো ভালো কাজ হবে? নবীজী (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, (ভালো কাজ হবে) তবে সেটার মধ্যেও কিছু খারাপ কাজ থাকবে।*

সাহাবীগণ বললেন, সেই খারাপ কাজ কী? নবীজী (সাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক থাকবে, যারা এমন কিছু জিনিস প্রচার করবে যেগুলো আমার সুন্নাহ নয়। সাহাবীগণ বললেন, এটার পর আরো কোনো খারাপ কাজ কি হবে? নবীজী (সাঃ) বললেন, হাঁ; কিছু লোক থাকবে যারা তোমাদের দোযখে আমন্ত্রণ জানাবে। তখন হুযাইফা (রা) বললেন, সে সময় আমাদের কী করা উচিত? নবীজী (সাঃ) তখন বললেন, তোমরা তোমাদের মুসলিম দল আর নেতাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, কোনো মুসলিম নেতা আর দল না থাকলে কি করবো? নবীজী (সাঃ) উত্তর দিলেন, যদি কোনো মুসলিম নেতা আর দল না থাকে তাহলে সব দল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলো। প্রয়োজন হলে গাছের শেকড় কামড়ে পড়ে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সামনা-সামনি হচ্ছো(মৃত্যু পর্যন্ত)।

ওয়াখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

সমাপ্ত